কাশ্মীর
প্রসংগ

কাশ্মীর ভ্রমণ

বিমলচন্দ্র সিংহ

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

॥ ভূমিকা ॥

ভ্রমণ কাহিনী বলতে সাধাবণতঃ যা বোঝায় এই বইখানি সম্ভবতঃ সে-ধবণেব হয় নি। বিভিন্ন স্থানেব সবিস্তাব বর্ণনা নেই, ভ্রমণকারীদের প্রয়োজনীয় নানা টুকিটাকি খববও নেই। দেহ ও মনে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় পরিচিত পবিবেশ হতে পালিয়ে সুদূব কাশ্মীরে গিয়েছিলুম। সেখানে যে আনন্দ পেয়েছিলুম সেই আনন্দটুকুই এই ছোট কটী পরিচ্ছেদের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা। যদি পাঠকেবা সেই আনন্দটুকুর আস্বাদ পান তাহলেই আমার যথেষ্ট পুবস্কাব।

কাশ্মীবে গিয়েছিলুম কয়েক বছর আগে, এই ক'বছরে হয় তো তার চেহাবা বদলেছে। কিন্তু তখন যা মনে হয়েছিল তাই রেখে দিয়েছি। ভ্রমণকাহিনী তো ইতিহাস নয়।

শ্রীযুক্ত অজিত গুপ্তেব উৎসাহে বইটী ছাপা হল, তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ভৌমিক প্রুফ দেখা ও নানা বিষয়ে সাহায্য করে আমায় কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছেন। এর নানা অংশ 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, সে ঋণেবও উল্লেখ করি।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

নেডুর হোটেল
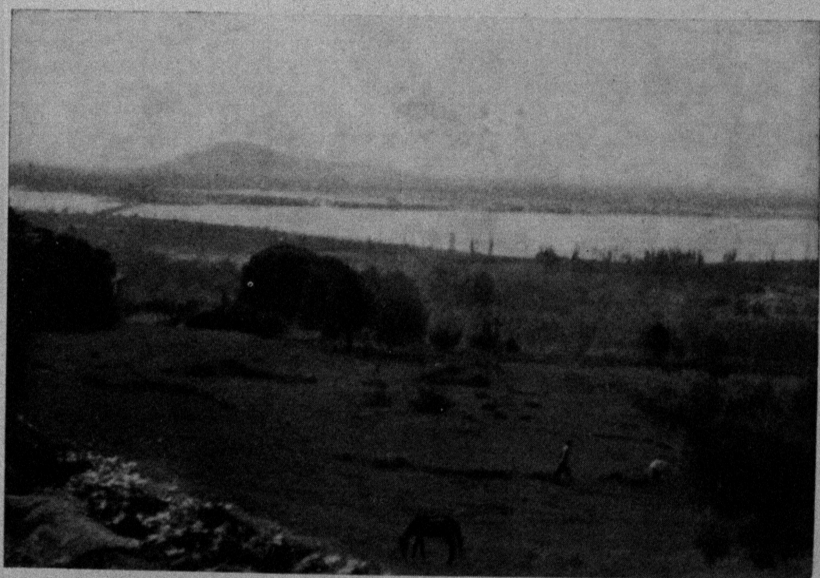
ডাল লেক—দূরে হরি পর্বত।   ডাল লেকের মধ্যে রাস্তা
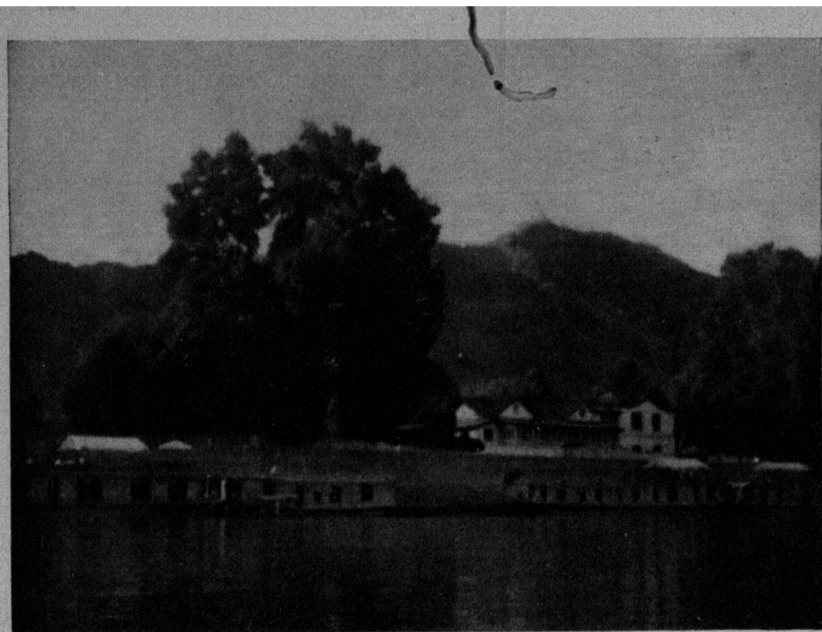
ঝিলম নদী, হাউস বোট, তীরে চেনার গাছ, দূরে তখৎ-ই স্থলেমান পর্বত,
তার মাথায় শঙ্করাচার্যের মন্দির। পাকা বাড়ীটি স্টেট গেস্ট হাউস
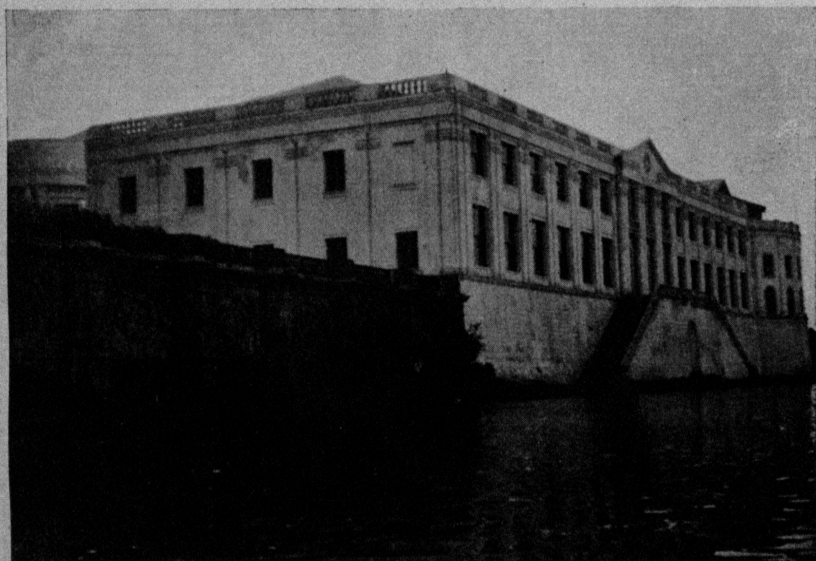
ঝিলমতীরে মহারাজার পুরানো প্রাসাদ—বর্তমানে সরকারী দপ্তরখানা
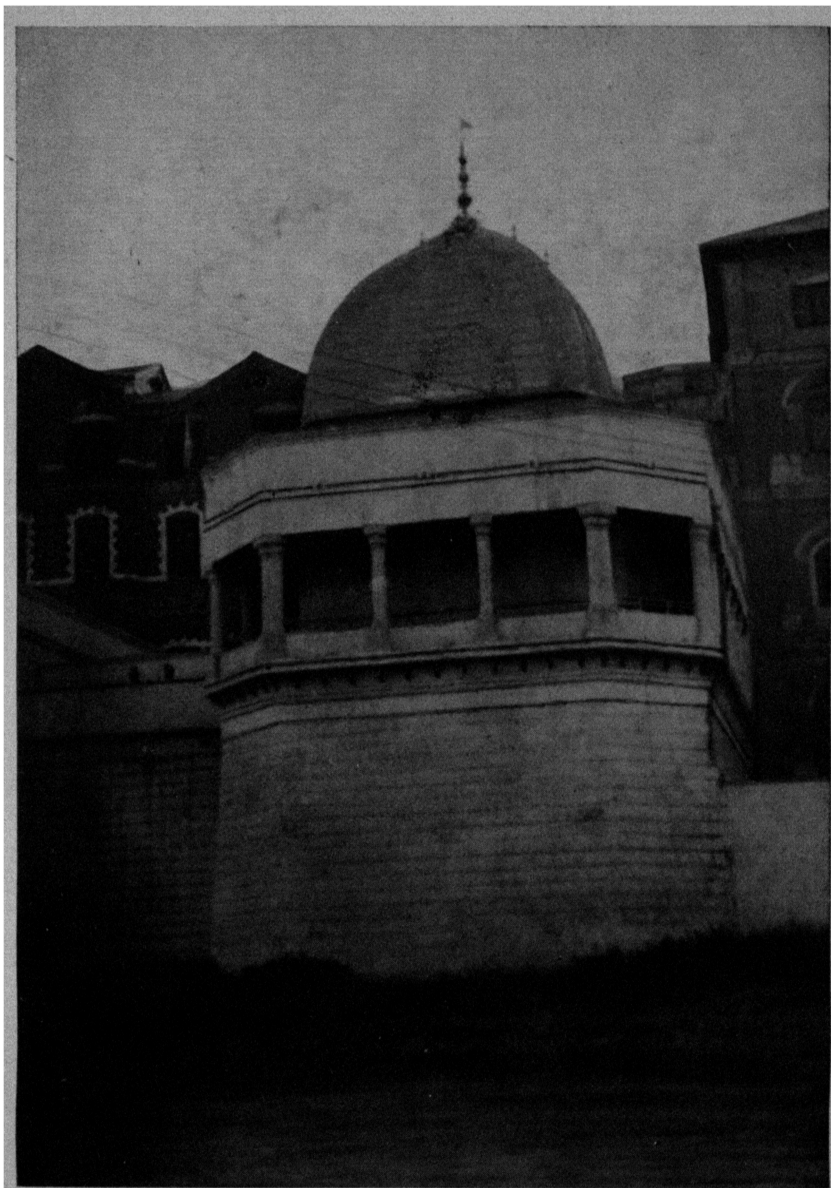
মহারাজার শিবমন্দির

খানিকটা কাশীর মত দেখতে
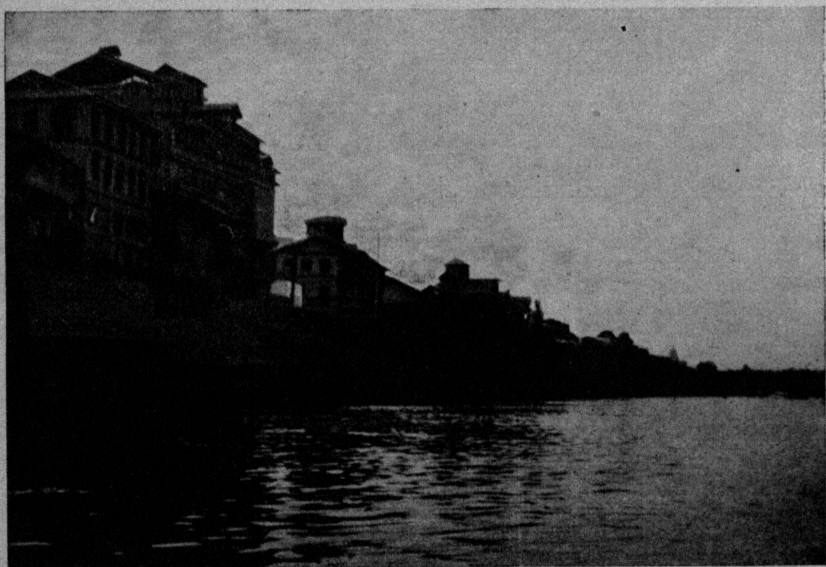
ঝিলম নদীর ধার — দু'তিনতলা বাড়ির সার — দূরে দুটি মন্দির চূড়া
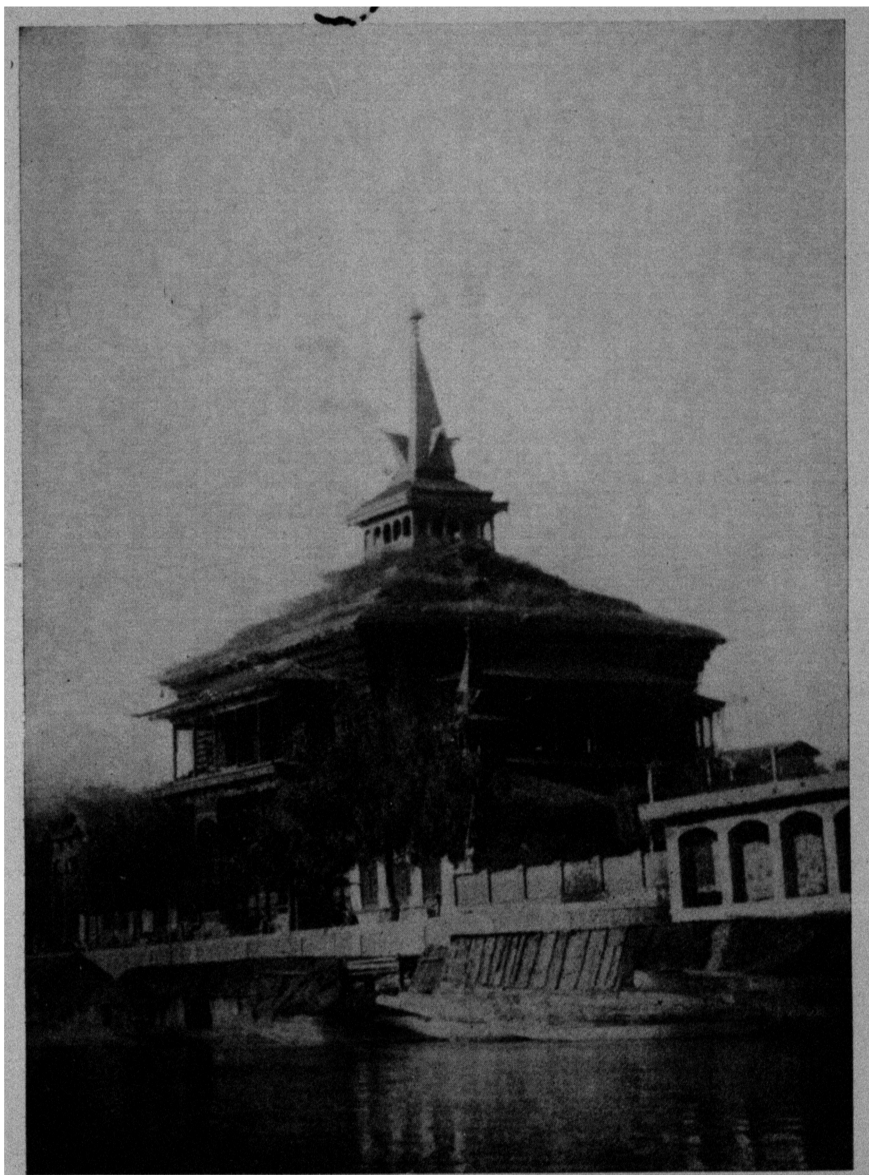
১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত শাহ্-ই-হামদান, পাশেই হিন্দু জিয়ারৎ
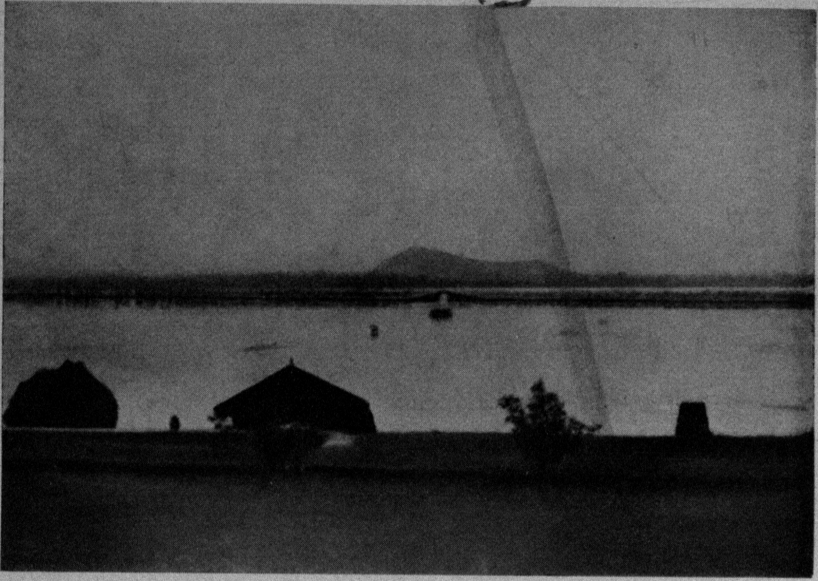
ডাল লেক—মধ্য দিয়ে রাস্তা—দূরে হরি পর্বত
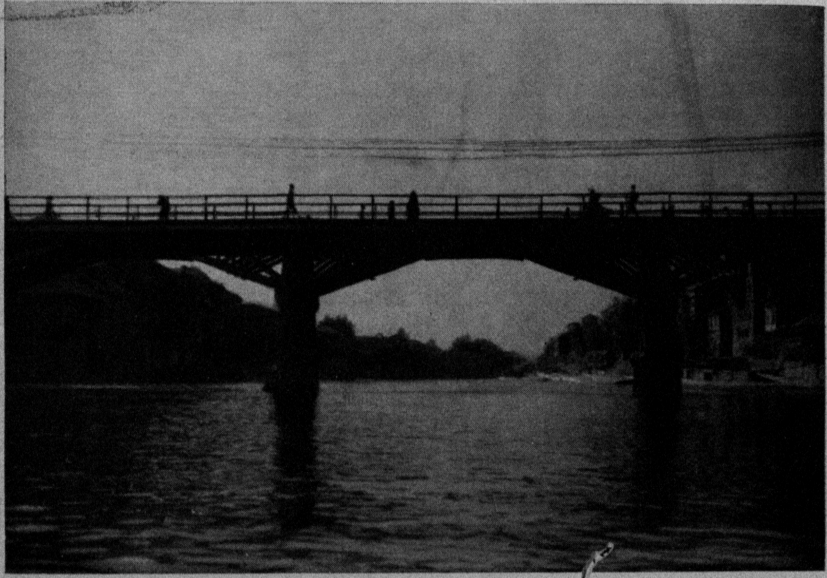
ঝিলম নদীর ব্রিজ—শ্রীনগর

চশমাশাহীর ঝরণা—পাথরের জালিকাজকরা উৎসমুখ

চশমাশাহী, উপরের থাক, ঝরণা বেরিয়ে আসছে
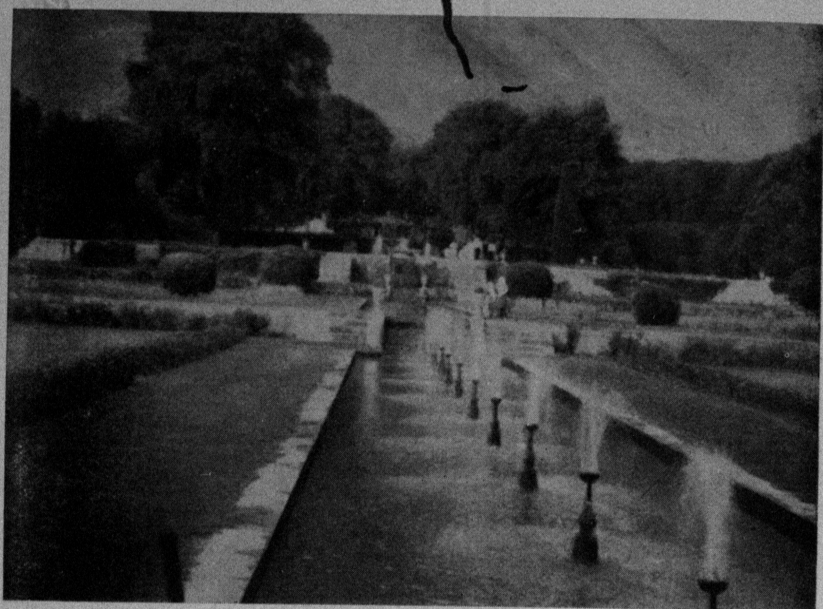
পাহাড়ের কোল থেকে থাকে থাকে নেমে এসেছে নিশাতবাগ। পিছনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে
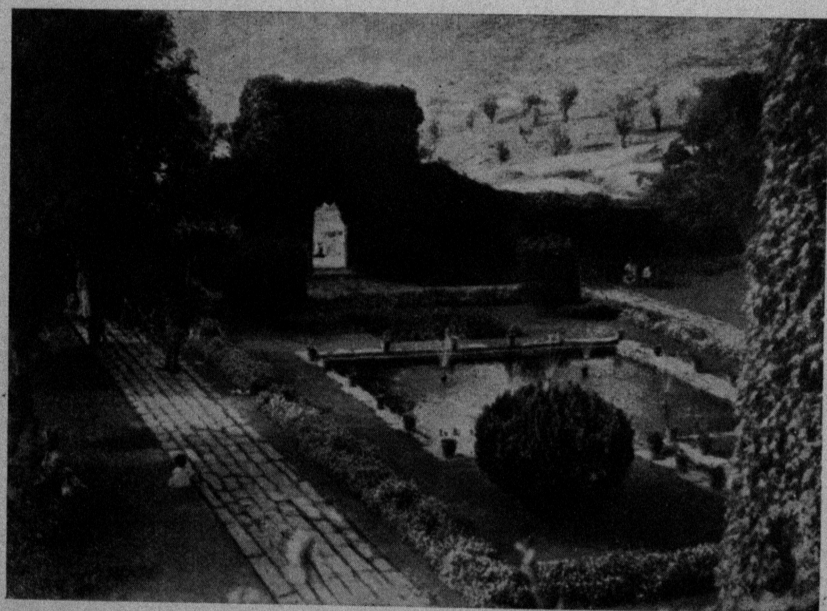
চশমাশাহী : উপরের থাক হতে নীচের থাকের দৃশ্য। ঝরণার জল, ফোয়ারা, ঝাউ, চেনার, মাধবীলতা
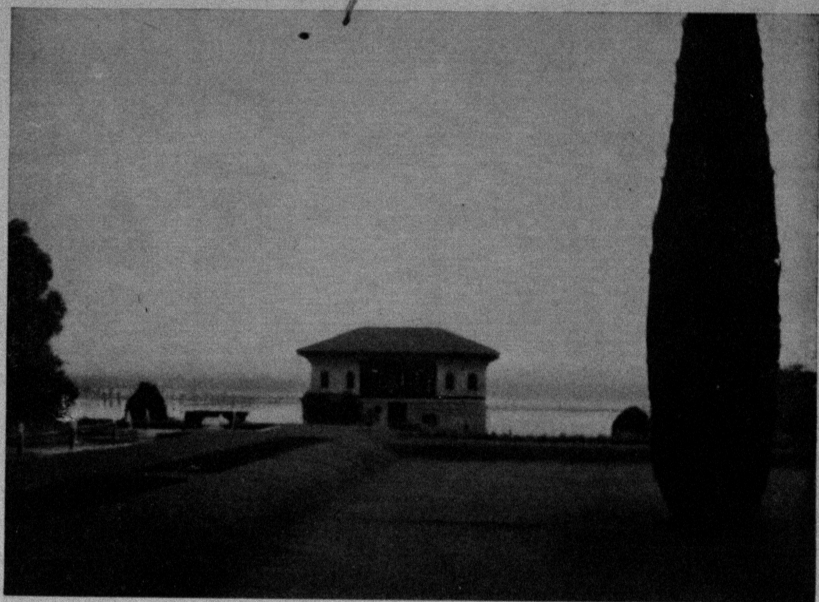
ডাল লেকের তীরে নিশাতবাগ শেষ হয়েছে

শালিমার বাগান

শালিমার বাগানে জলটুঙ্গী—ঝরণা ঝরছে

শালিমার—খিলেনের মধ্য দিয়ে দূরে জলটুঙ্গী দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ঝরণা নেমে আসছে। ফোয়ারা
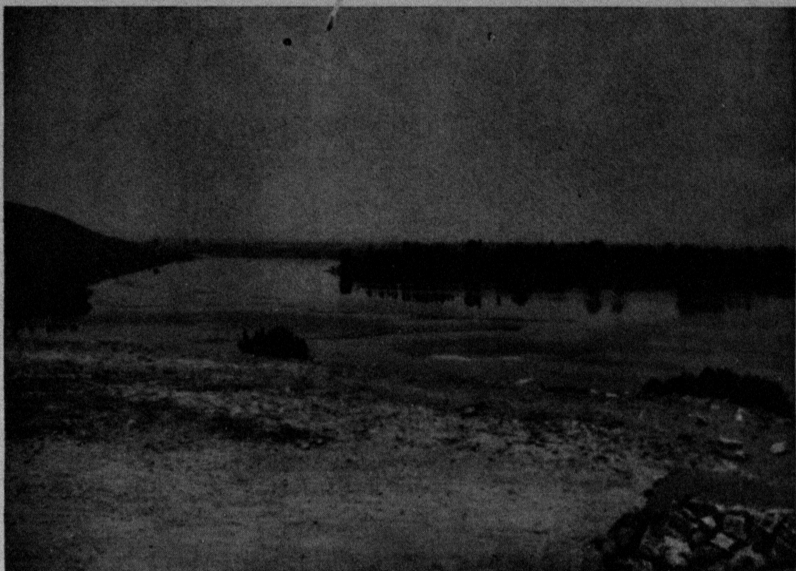
মানসবল হ্রদ। ডানদিকে গাছের সারি যেখানে হ্রদের কিনারায় শেষ হয়েছে
সেইখানে রোশেনারার ঝরোখার ধ্বংসাবশেষ
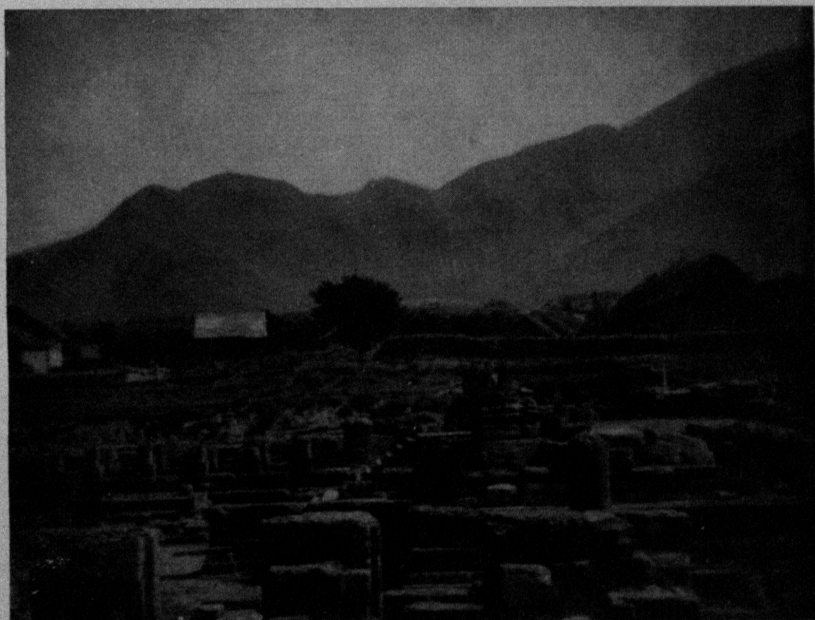
অবন্তীপুর ধ্বংসস্তূপ
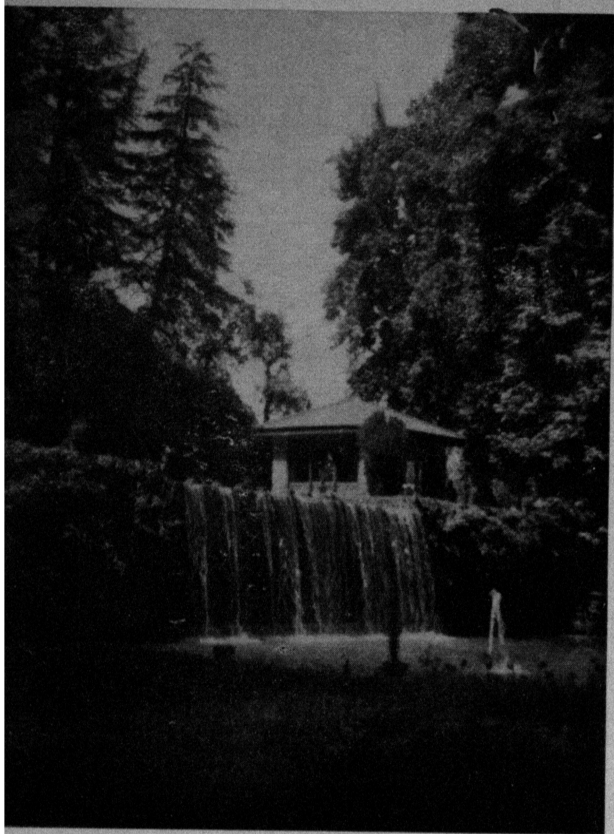
আচ্ছাবল বাগান—মূল ঝরণা।

পহলগ্রামের পথ—লিডর নদী
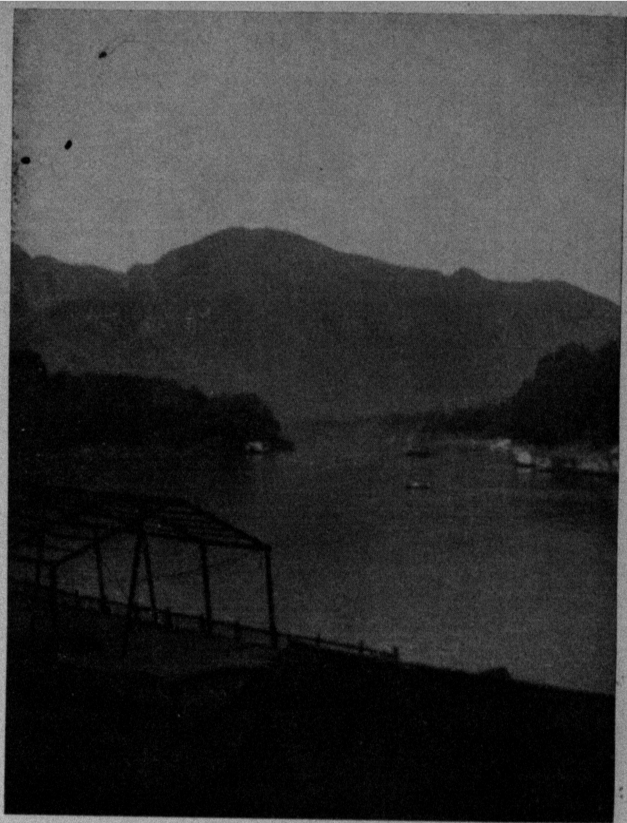
শহরের বাইরে ঝিলম নদী পাহাড়ের তলা দিয়ে চলেছে

জ্যুরিক। লিমাং নদী, ব্রিজ, ব্রিজের দক্ষিণধারে হোটেল জ্যুম স্টর্কেন, পাশে গির্জা
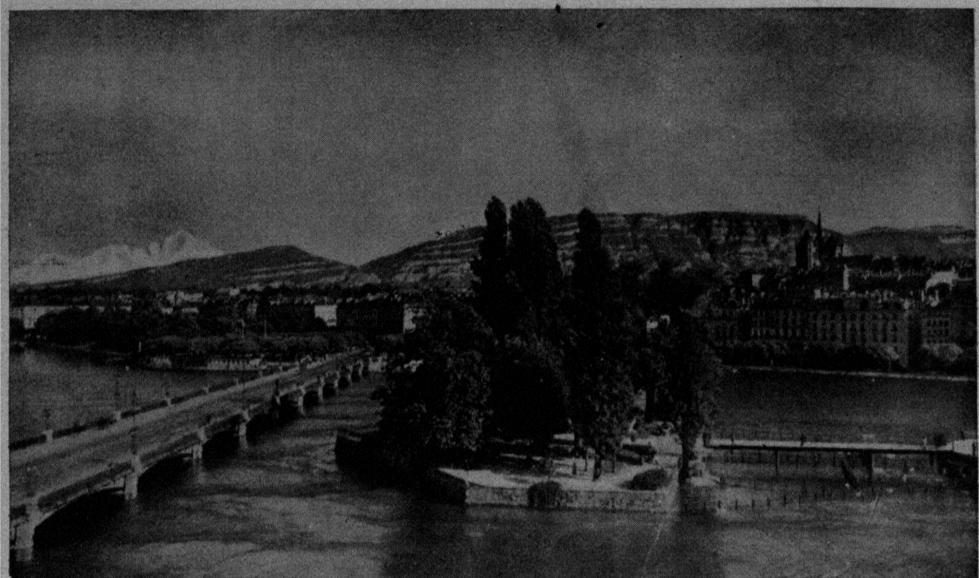
জেনিভা : রোণ নদী, মঁ ব্লঁ ব্রিজ, রুশো দ্বীপ, দূরে মঁ ব্লঁ শিখর
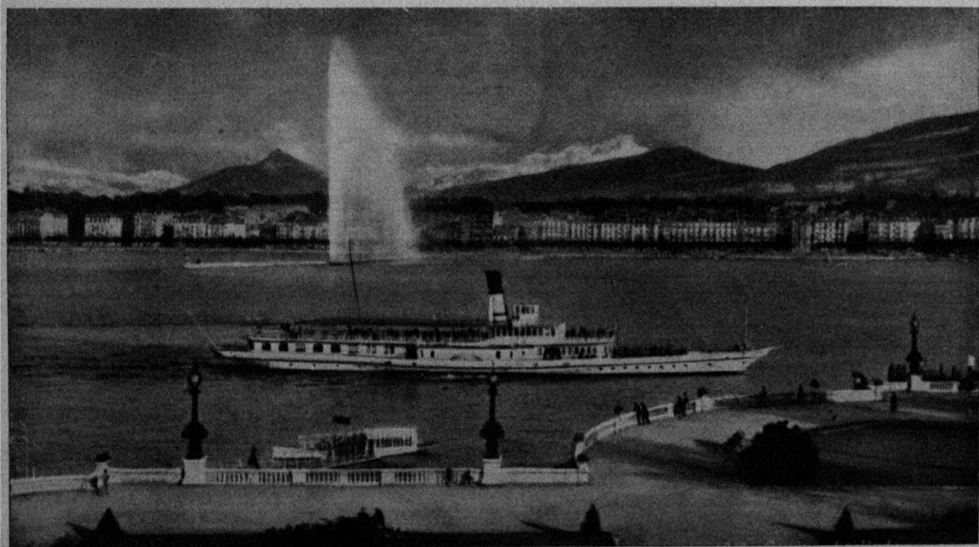
জেনিভা : লেক, স্টীমার, বাগান, হ্রদের ধারে বৈদ্যুতিক আলোকমালা

পহলগ্রাম : পথের শেষ : তুষারচূড়ার শুরু : পাইন বন
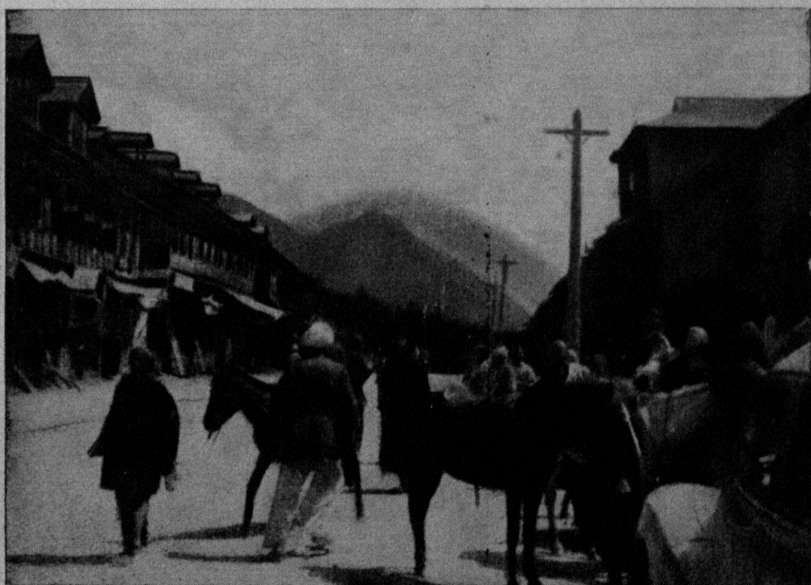
পহলগ্রাম বাজার

গ্রাম, চালাঘর
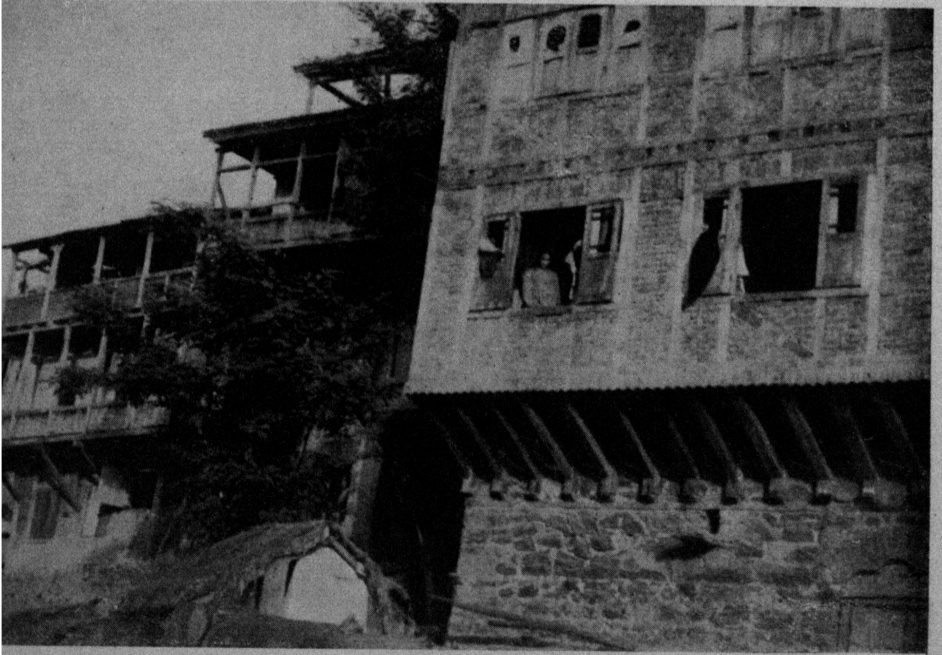
অধিকাংশ বাড়ীর নমুনা ঃ প্রথম তলা পাথরের গাঁথনি, উপর তলা কাঠের ফ্রেমে, টুকরো ইঁটে ভরতি। টিনের ছাদ, পলেস্তারার বালাই নেই

সাদিক চেলা

॥ এক ॥

কিছু লোক আছেন যাঁদের ঘুরে বেড়াতে ক্লান্তি নেই। অনবরতই তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক দেশ থেকে অন্য দেশ। মোটঘাট বাঁধা, টিকিটপত্র কেনা ইত্যাদি ভ্রমণের আনুষঙ্গিক হাঙ্গামাকে এঁরা মোটেই ভয় পান না— বরং কিরকম অল্প আয়াসে এঁরা এসব অতিক্রম করে কেবলই ঘুরে বেড়ান, দেখলে আশ্চর্য লাগে। এক ভদ্রলোককে আমি জানি, প্রায় প্রত্যেক বছরই তিনি বছরটা শুরু করেন ইউরোপ ঘুরে আর বছরের শেষ দিকটায় চক্কর মারেন জাপান পর্যন্ত। পাসপোর্ট, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার হাঙ্গামা, নতুন নতুন হোটেল খুঁজে বার করা— এসব তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম। আমাদের দেশটাও তো কম বড় নয়। তার উপর এদেশে স্বল্প হাঙ্গামায় ঘুরবার সুবিধে খুব কম। কলকাতায় বসে লণ্ডন-প্যারিস-জেনেভা-রোম তো বটেই, ইউরোপের ছোট ছোট শহরেও হোটেলের ব্যবস্থা, যাতায়াতের ব্যবস্থা, প্লেন-ট্রেনের টিকিট, সবই টমাস কুকের কল্যাণে ঠিক করে ফেলা যায়— সব ঘড়ির কাঁটার মত চলে। কিন্তু মাথা খুঁড়েও এখানে সব জায়গায় সে ব্যবস্থা করা চলে না। বোম্বাই দিল্লীতে হয়তো এ ধরনের ব্যবস্থা সম্ভব, কিন্তু মথুরা বৃন্দাবন কাশীর বেলায় কি হবে? এমনকি বাঙালীর চিরাচরিত পূজাবকাশ কাটাবার জায়গা দেওঘর মধুপুর রাঁচি হাজারিবাগ ঘাটশিলায়? কোনও উপায় নেই— মোটঘাট বিছানাপত্তর বেঁধে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সপরিবারে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেন ধরতে হবে, লেপকম্বলের

বাণ্ডিল সঙ্গে নিতেই হবে, আমসত্ব আর বড়ির হাঁড়িটাও ফেলে যাওয়া চলবে না, সারা ট্রেন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে কখন কোন্ জিনিসটা হারালো,— তারপর যদি কোনরকমে গন্তব্যস্থানে পৌঁছন গেল তো মনের মত একটা আড্ডা ঠিক করতে গলদ্ঘর্ম হতে হবে, নতুন করে চালডালের সন্ধান করতে হবে, হয়তো বা রেশন কার্ডও করাতে হবে, কোথায় ভাল দুধ পাওয়া যায় তার সন্ধান করতে হবে, গৃহিণীর আজ্ঞায় ন-টাকা সেরের চেয়ে সস্তাদরে খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে করতে হিমসিম খেতে হবে— তারপর এত কাণ্ড করে গুছিয়ে বসতে না বসতে ছুটি যাবে ফুরিয়ে এবং এইসব হাঙ্গামা করতে করতে আবার ফিরে আসতে হবে, মাঝ থেকে হয়তো কারও অসুখবিসুখ করবে এবং সবার উপর গৃহিণী মন্তব্য করতে থাকবেন যে, এমন অকেজো লোক তিনি আর একটিও দেখেন নি এবং এইরকম লোকের হাতে পড়ে তাঁর হাড়মাস কালি হয়ে গেল। এ যেন প্রাণধারণের চেষ্টাতেই প্রাণশক্তি ফুরিয়ে দেওয়া, জমার চেয়ে খরচ বেশি। গত কয়েকবছর বাঙালীর জীবন কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে — তা না হলে পুজোর সময় হলেই বাঙালীকে যেন বিদেশে ছড়িয়ে পড়তেই হত। বাস্তবিক পুজোর সময় হলেই আর কোনও কথা নেই, কেবলই আলোচনা হচ্ছে এবার কোথায় যাওয়া যায়। কাশী, পুরী, দেওঘর, হাজারিবাগ, রাঁচি, মধুপুর, গিরিডি ?

অথচ আমি লোকটা এমন কুঁড়ে যে আমার আদপেই এ সব পোষায় না। ভাল ভাল দৃশ্য, নতুন নতুন দেশ, নতুন ধরনের মানুষ দেখতে কার না ইচ্ছা করে ? কিন্তু তার জন্য যদি অসাধারণরকম হাঙ্গামাই করতে হল তাহলে আর লাভ কি ? কিন্তু শুধু হাঙ্গামার কথা নয়। ধরা গেল— কচিসংসদের গল্পের মতই কোনও অঘটন-ঘটনপটীয়সী দেবী গৃহিণী রূপে আবির্ভূতা হয়ে এই সব হাঙ্গামার অবসান করলেন— কিন্তু তবু আমি ঘুরবার নামে ভয়

পাই। ঘরটা এমন পরিচিতির মায়ায় বেঁধে ফেলেছে যে তার মায়া কিছুতেই কাটাতে পারি নে। ঐ যে দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে বিছানার মধ্যেখানটা বসে গিয়েছে, শুতে গেলেই মাধ্যাকর্ষণের টানে ঐখানটায় গড়িয়ে আসতে হয়; ঐ যে চেয়ারটার হাতল ঢিলে হয়ে গিয়েছে, সাবধানে টেনে বসতে হয়; ইচ্ছে হলেই পাশে আমার লেখার টেবিলটায় বসতে পারি, তার এলোমেলো কাগজের স্তূপ থেকে দরকারী কাগজ আমি ছাড়া আর কেউ-ই খুঁজে বার করতে পারে না; ঐ যে জানলাটার চৌকো ফ্রেমে-আঁটা ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আকাশের তলায় দুটো নারকেল গাছ দেখা যায়-- এসবের মায়ায় এমনই আটকে গিয়েছি যে বাইরে নবনীতকোমল শুভ্র-শয্যা আমার ভালোই লাগে না, ঐ হাতল-নড়া চেয়ার ও অগোছালো লেখার টেবিল ছাড়া আমার চলেই না, ঐ আকাশটুকুর সকাল-থেকে-সন্ধ্যে সন্ধ্যে-থেকে-সকাল রংবদল আর মেঘের খেলা দেখতে দেখতে আমার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ সবগুলো জীবনের টানা-পোড়েনের মধ্যে এমনই বোনা হয়ে গিয়েছে যে এগুলো এখন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্য জায়গায় গেলেই অনুভব করি এগুলো কতখানি অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য কোথাও গেলে সেই জন্য আবার নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার রীতিমত চেষ্টা করতে হয়।

অবশ্য বলতে পারেন এটা নিছক কুঁড়েমি। কিন্তু শুধুই কি কুঁড়েমি? কারণ, কুঁড়েমি ছাড়াও তো অন্য একটা জিনিস আছে। মনে পড়ে, গুপ্তনিবাসে একদিন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দোতলার বড় বারান্দায় বাগানের দিকে মুখ করে একটি ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তিনি। বললেন, রবিকা যে লিখে গিয়েছেন ঘর থেকে দু-পা বেরিয়ে শিশিরবিন্দু দেখবার কথা, সে কি শুধু কথার কথা? চোখ থাকলেই দেখা যায়। সামনের দিকে দেখো তো চেয়ে— ঐ যে ঘাসগুলো তার গোড়ার

দিকে কেমন একটি রং, ডগার দিকে কেমন আর একটি রং। মেঠো ফুল ফুটেছে, তার মধ্যেখানটিতে কেমন গভীর রঙের টান, পাপড়িগুলোর ধারটিতে কেমন হাল্‌কা রং ধীরে ধীরে মধ্যেখানের গভীর রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। গাছের পাতাগুলোর মধ্যে তেমনি কতরকম রঙের খেলা। ঐ পাখীটা ঘুরছে দেখো—তার পা'গুলি কেমন, ডানাটা কেমন নীল নীল, বুকের কাছটায় পাখার পাশে কেমন শাদা শাদা ছিট। আকাশের রঙের খেলার তো কথাই নেই। সৃষ্টির রূপকার কত রঙে জগৎটাকে রঙিয়ে দিয়েছেন, চোখ থাকলেই দেখা যায়। সত্যিই তাই। ঘরের কাছেই তো বিস্ময়ের অন্ত নেই, কিন্তু আমরা তার কতটুকুই বা দেখি? রোগের প্রকোপে যখন দীর্ঘদিন শয্যাগ্রহণ করেছিলুম তখন ছ-মাস ঐ জানলার মধ্য দিয়ে নজরে পড়া এক টুকরো আকাশ ছাড়া বাহির বিশ্বের সঙ্গে আমার আর কোনই যোগ ছিল না। কিন্তু ঐ আকাশটুকু তার অনন্ত বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার আমার বিস্মিত চোখের সামনে উজাড় করে দিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠের দিন ভোরবেলা হতে সেই আকাশে আগুন ঝরত, তীব্র আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে যেত, আলসের ছায়ায় পাখীরা আশ্রয় খুঁজত, দুপুর বেলায় সমস্ত জগৎ যেন থমথম করতে থাকত। সেই আকাশের চেহারা ক্রমে পালটে গেল, নীল রঙের আর চিহ্ন নেই, সারা আকাশ ঘোলাটে রঙে লেপাপোছা একাকার, ধারাস্নানে নারকেল গাছগুলো সবুজ হয়ে উঠল, ভিজে-যাওয়া পালকফোলা কাকগুলোর পর্যন্ত নতুন চেহারা। তারপর দেখলুম শরতের প্রসন্ন আভা, গভীর নীল আকাশে শাদা মেঘের খেলা, সারাদিন কাঁচা সোনার মত রৌদ্র আর সারারাত কুন্দফুলের মত জ্যোৎস্না। দিন হতে রাত্রি, রাত্রি হতে দিন, ঋতুর পর ঋতু—কত বিচিত্র লীলা ঘটে চলেছে, আমার বিস্ময়ের ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে কেড়ে নিয়েছে, তার জন্য ঐ একটুকরো আকাশ ছাড়া আর কিছুর তো দরকার হয় নি। নড়নচড়নহীন হয়ে

আলোবাতাস যথেষ্ট কম, দু-পাশে দু'টি পাথরের বাড়ী, তার ঘরগুলি অন্ধকার, বাথরুমগুলিতে ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ, সামনে একটা বাগান, কিন্তু তাতে ডালিয়া ছাড়া কিছু ফুল নেই, দার্জিলিঙের উইণ্ডামীয়র হোটেলের সঙ্গে তুলনা করলে এটা তার শতাংশেরও একাংশ নয়— বাগানে তো নয়ই, ঘরেও নয়। স্থানাভাবে বাধ্য হয়ে সেখানেই দুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, কিন্তু অনবরতই মনে হতে লাগল, আমরা কি এইজন্যই বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে এই পর্বতমালা দেখতে এলুম? কিন্তু এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আরও একটা কথা মনে হতে লাগল। দিল্লীতে থাকতে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখতে গিয়েছিলুম, মীরাটের কাছে হস্তিনাপুরও দেখেছি। পথে আসতে কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে এলুম। এক হিসেবে কুরুক্ষেত্রই তো হল ভারতীয় সভ্যতার সীমানা। আলেকজান্দার হতে শুরু করে কতবার কত আক্রমণ পশ্চিমদিক থেকে হয়েছে, কখনও বা সিন্ধুনদীর ধারে, কখনও বা পানিপথে শক্তিপরীক্ষা চলেছে, কুরুক্ষেত্র বা পানিপথের সীমানা যে পেরোতে পেরেছে সে সমস্ত উত্তর ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে, ভারতের ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিককালে কুরুক্ষেত্রও তো এমনই একটি শক্তিপরীক্ষার সীমাস্তম্ভ। সেইজন্য সিন্ধু পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশ ইতিহাসের আবর্তে কখনও ভারতের মধ্যে থেকেছে, কখনও অভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু যখনই ভারতে কোন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে— তা সে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক্ বা ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক্— অমনই তা পঞ্চনদের ওপার থেকে পুবে-পশ্চিমে বিস্তৃত হতে হতে ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। আজ সে সব সম্রাট নেই, সেইসব মহাপুরুষও নেই, কিন্তু তাঁদের চিহ্ন আজও তো চার পাশে ছড়ানো, আজও তো সে জীবন্ত সত্য, আজও তো সে নতুনভাবে মহাভারত-কথা রচনা করে চলেছে। শ্রীনগরে এসে দেখলুম,

সেই মহাভারতের হরিপর্বত, যে পথ দিয়ে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন, যেখানে দ্রৌপদীর দেহপাত হল বলে জনশ্রুতি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু সাম্রাজ্যে সুখ নাই, সমস্ত ত্যাগ করে পাণ্ডবেরা চললেন মহাপ্রস্থানের পথে, সঙ্গে ছদ্মবেশে ধর্ম, মহাহিমে একে একে পাণ্ডবদের দেহপাত হতে লাগল, তবু তাঁরা কি মহারহস্যের আকর্ষণে এগিয়ে চললেন। যখন এই কথা ভাবি তখন মনে হয়, মহাভারত-কথা তো কেবল বেদব্যাসের রচনা নয়, পুরাণের কাহিনী নয়, ভূগোলের সীমানা নয়, সব মিলিয়ে আজও তা ভারতবর্ষের মহাকাশকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, পলে পলে, তিলে তিলে সে মহাভারত-কথা আজও রচিত হয়ে চলেছে যার টান বক্ষে অনুভব করে কত মহাপুরুষ এইসব পথে যাত্রা করেছেন, কত কেদার-বদরী মন্দির কত জ্যোতির্মঠ রচিত হয়েছে, আবার কত মহাপুরুষ আছেন যাঁদের যাত্রার কোন চিহ্নই তাঁরা রেখে যান নি, তবু তাঁদের মহিমায় এই সব যাত্রাপথ উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখে, এই কাশ্মীরে একদিন মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল, তিনিই নাকি শ্রীনগর শহরের প্রথম সূচনা করেন। তাঁর শিলালিপি নাকি মানসেরা এবং অন্যত্রও পাওয়া গিয়েছে, তারপর এককালে কুশান সাম্রাজ্য সারনাথ থেকে শুরু করে কাশ্মীর গান্ধার ছাড়িয়ে খোটান অবধি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সেসব কথা তুলছি নে। তার চেয়েও বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে যাঁর গুহা-প্রবেশ হল, অথচ সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কি অমিতবীর্যে অদম্য তেজে তিনি পদব্রজে সমস্ত ভারত পরিক্রমা করলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার ঘটলো অভ্যুদয়, অদ্বৈতবাদের হল প্রতিষ্ঠা, ভারতের চতুঃসীমায় রচিত হল চার মঠ— সেই সন্ন্যাসী এই সুদূর সীমান্তে এসেও প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর মহিমা। ডাল লেকের ধারে তখত্-ই-সুলেমান পর্বত, তার মাথার উপরে

বিছানায় শুয়ে না থাকলে হয়তো এ জিনিস কোনও দিন চোখেই পড়ত না। কিন্তু মানুষে দেখুক আর নেই দেখুক, এ বিচিত্র লীলা তো এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নেই। সে লীলা এত অভিনব, এত বেশি বিচিত্র যে ঐটুকু আকাশের অনন্ত বিস্ময় একজনে পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না; তার প্রাচুর্যের ভারে পীড়িত হতে হয়, বুকটা টনটন করতে থাকে। সাতসমুদ্র পেরিয়ে দৃশ্য দেখতে যাবার কি সত্যিই কোনও দরকার থাকে এমন হলে ?

তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি সিসেরোর কথা—To me, the man hardly seems to be free, who does not sometimes do nothing (Cicero)। কুঁড়েমির জয়গান করছি নে। যে মানুষটা কোন কালেই কিছু করল না, নিছক কুঁড়েমি করেই কাটিয়ে দিল তার জীবনটা নিশ্চয়ই বিকশিত হল না। যে ঐশী-অশান্তির স্পর্শে মানুষের মনে চঞ্চলতা জাগে, হৃৎকম্পন ধীরে ধীরে ফুটে উঠে, আপন গভীর সত্তাকে চিনবার অধীর আগ্রহে সে নতুন নতুন পথে জয়যাত্রায় বেরোয়, সে ঐশী অশান্তির স্পর্শ না পেলে মানুষ মানুষই হল না। কিন্তু এ কথাটা অন্য। প্রাণধারণ ও জীবিকার্জনের চেষ্টায় আমরা তো দিনরাত এমনই ঘুরি, জীবনযাত্রার যুদ্ধে আমাদের তো এমনিতেই কোনও অবসর নেই, তার ওপর ভদ্রতার ও সামাজিকতার নানারকম তাগিদ আছে, এমনকি বাড়িতে এলেও দেহ-মনের অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও গৃহিণী যা বলেন তা হাসিমুখে শুনতে হয়, এতেই তো আজ প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে চলেছে। তার উপরও যেই ছুটি মিলল অমনি যেহেতু পিসশাশুড়ির দেওরঝিরা দেওঘর বেড়াতে গিয়েছেন সেহেতু আমাদেরও কোমর বেঁধে লটবহর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উটকামণ্ড বা মাউন্ট আবু, নিতান্তপক্ষে হাজারিবাগ কি শিলং দৌড়তেই হবে— এমনতর কথায় আমার মন কিছুতেই উৎসাহ পায় না। এই রকম বাধ্যবাধকতা থাকলে সত্যিই কি মানুষ free ? তার সব শক্তিই যদি বাইরের দিকেই নিঃশেষ হয়ে গেল তাহলে তার অন্তরকে ফুটিয়ে তোলবার

জন্য আর কি শক্তি থাকবে? বীজ ফুটবার আগে অঙ্কুর কিছুদিন নিবিড়ভাবে বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, জীবনপথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করবার আগে শিশু মাতৃকক্ষের গভীর আশ্রয় আঁকড়ে থাকে। যেমন, মহাত্মাজীর সাপ্তাহিক মৌনব্রত ছিল নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের উপলক্ষ্য। যে লোকটা যত বেশি পরিমাণে মানুষ তার তত বেশি দরকার সময়ে সময়ে নিজের মধ্যে খুব গভীরভাবে আত্ম-সংহরণের, তা না হলে জমার চেয়ে খরচই বেশি হয়ে যাবে। যেমন সমষ্টির বেলায় আন্দ্রে জিদ্ বলেছেন, Culture, too, like the seed in the Gospel, needs to sink in the tomb in order to burst forth again, তেমনই ব্যষ্টির বেলাতেও একথা সত্য। কারণ, সবসময় বাইরের দিকে তাকালে ভিতরের দিকে তাকাবার অবসর থাকে কই?

কিন্তু দৈবের লিখন এড়ানো যায় না। মনে মনে এই সব কথা যতই ভাবি না কেন, কাজের বেলায় দেখি আমাকে কেবলই ঘুরতে হয়, এমনকি বাক্সবিছানা খুলে রাখবারও অবকাশ হয় না। সে ঘোরা নানা জায়গায় ঘোরা— কখনও কাছাকাছি, কখনও দূরে, কখনও বাংলাদেশের নানা অজানা কোণে, কখনও বাংলাদেশের বাইরে, কখনও বা ভারতবর্ষের সীমানাও ছাড়িয়ে। সবটাই যে লোকসান হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। বরং একদিকে এমন একটি লাভ হয়েছে যা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। একালের তীর্থযাত্রা নামজাদা বায়ু পরিবর্তনকেন্দ্রগুলির ঘাটে ঘাটে, সেকালে তীর্থের মতই এতদিনে তার পথ বাঁধা হয়ে গিয়েছে। রাঁচি গেলেই রাজরোপ্পা হুণ্ড্রু ফলস নেতারহাট যেতে হবে এরকম ধরনের একটা অলিখিত নিয়মে সকলেই বাঁধা। সেখানে আমরা সকলেই একটা যেন অদৃশ্য conducted tour-এর পাল্লায় পড়ে গিয়েছি— ধরেই নিতে পারা যায় যে, যাঁরা রাঁচি গিয়েছেন তাঁরা ওসব দেখেছেনই, যাঁরা দেওঘর গিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ত্রিকূট পাহাড় তপোবনে বেড়িয়ে এসেছেন, যাঁরা গিরিডি

গিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পরেশনাথের মাথায় চড়েছেন, যাঁদের নীল সমুদ্রতটে (Cote-Azure) যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই নীস্ মন্টি কার্লো সাঁরেমোর তীর্থদর্শন করেছেনই, নেপ্‌লসে গেলে ভিসুভিয়স দেখুন বা না-ই দেখুন কাপ্রি দ্বীপে বেড়িয়ে আসতে নিশ্চয়ই ভোলেন নি, পারি'তে গেলে ঈফেল টাওয়ার ও লুভর-এর সঙ্গে সঙ্গে ফোলিস বার্জারের নৃত্যগীত নিশ্চয়ই বাদ যায় নি। কিন্তু বাংলাদেশকে ভাল করে দেখবার সুযোগ ক-জন বাঙালীর হয় ? ক-জন বাঙালী বাংলাদেশের অজানা অখ্যাত-নামা প্রত্যন্তগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করবার সুযোগ পান ? সমুদ্রধৌত সুন্দরবনের গভীর গম্ভীর অরণ্য আর সমুদ্রের মত নদী হতে শুরু করে রাঢ়ের তরঙ্গায়িত অঞ্চল, অজয় ময়ূরাক্ষীর ধারে ধারে তান্ত্রিক আর বৈষ্ণব সমাজের ধ্বংসাবশেষ, পীঠস্থান আর বৈষ্ণব বাউলের আখড়া, নানুর বা কেঁদুলীর মন্দির ? অথবা, পদ্মার শাদা চিকচিকে জলস্রোতের ধারে ধারে বিস্তীর্ণ ক্ষেত আর মাঠ, জলপাই-গুড়ির গিরিনদী আর চা-বাগান, জল্পেশের মন্দির ? বা বাঁকুড়ার রুক্ষপ্রান্তর যেখানে তরঙ্গায়িত ভূমির অরণ্যসঙ্কুলতায় শেষ হয়ে গিয়েছে তার অপূর্ব দৃশ্য ? যখন কোনও বায়ু পরিবর্তনের নামজাদা তীর্থকেন্দ্রে যাই তখন যা দেখি, জানি তা সকলেই দেখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোণে-কোণে ঘুরবার সুযোগ পেয়ে বাংলার এই অপূর্ব রূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতির যে সুযোগ পেয়েছি জমাখরচের অঙ্ক মিলিয়ে সেটায় জমার অঙ্ক বেশি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেকথা যাক। এবার যখন তীর্থ ছাড়া অন্য কোথায়ও হাওয়া বদলের উপায় ছিল না তখন ভাবা গেল যে তাহলে এবার একটা নামজাদা তীর্থেই যাওয়া যাক। বিশেষত সুইট্‌জরল্যাণ্ড দেখেছি অথচ কাশ্মীর দেখি নি, এ অপবাদ রাখবার জায়গা নেই। অতএব ঠিক করা গেল এবারকার যাত্রা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

॥ দুই ॥

আমরা যখন দিল্লীর বায়ুপোত থেকে যাত্রা করলুম তখন সকাল-বেলাতেও ধুলোর ঝড় বইছে, চার পাশে ধুলোর অন্ধকার। একটু উপরে উঠতে ধুলোর ঝড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নজরে পড়তে লাগল চার পাশের ধূসর রুক্ষ রূপ। যতবারই বাংলা থেকে দিল্লী এসেছি বা দিল্লী থেকে বাংলায় গিয়েছি, বাংলার পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘ আর শ্যামল সরস মাটির সঙ্গে এই ধুলোর ঝড় আর রুক্ষ মাটির তুলনা না করে পারি নি। বাংলা তো নতুন-জেগে-ওঠা পলিমাটি, হাজার নদীনালা তাকে শ্যামল সিক্ত করে রেখেছে, ফসলে গাছে সে ঘন সবুজ। আর, দিল্লী বহু প্রাচীন দেশ, কত যুগের ঝড়-ঝাপটা সইতে সইতে তার মাটি গিয়েছে উড়ে, পাথরের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, সেই কঙ্কাল-পঞ্জর ভেদ করে কিছু কিছু কাঁটা গাছ ঝোপ-ঝাড় জন্মায় মাত্র। শুধু কি ভৌগোলিক অর্থে একথা সত্য? কত রাজত্ব, ইতিহাসের কত যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এখানে, কুরুক্ষেত্রের সময় থেকে ভারতবর্ষের নবতম স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের কঙ্কাল জড় হয়েছে এখানে, তার শুকনো হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলির সঙ্গে উড়ছে আকাশে। এমনকি, দিল্লীর গাইড-বুকে লেখে যে নাদির শাহ দুররাণী দিল্লীবাসীদের হত্যা করে সেখানে বহু নরমুণ্ড স্তূপীকৃত করেছিলেন ঠিক সেই টিলার উপরই ভাইসরয়ের (বর্তমান রাষ্ট্রপতির) আবাসভবন গড়া হয়েছে, লুটিয়েন্স (Lutyens) এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ নাকি অজানিতে সেই জায়গাটাই ঐ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেছিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্রীনগর এসে পৌছলাম। মনে হল, এই পথ আগে সন্ন্যাসীরা হেঁটে অতিক্রম করতেন। মোগল সম্রাটদের সময় সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, তাঁবু নিয়ে কত মাসে এই পথ অতিক্রম করতে হত, আর আজ আমরা বিজ্ঞানের কৃপায় পাহাড় টপ্‌কে ক-ঘণ্টার মধ্যেই সে পথ পেরিয়ে এলাম। অবশ্য দিল্লী থেকে আমাদের বায়ুযাত্রা মোটেই আরামের হয় নি। অমৃতশহর পর্যন্ত কোন রকম অসুবিধা হয় নি বটে, কিন্তু তারপরই আমাদের বায়ুরথ এমন নাচন আরম্ভ করল যে, প্লেনের ভিতরে আমাদের টেঁকা কোন রকমে সম্ভব হলেও আমাদের ভিতরে আহার্য-বস্তুর টেকা কোন রকমেই সম্ভব হল না। এইভাবে এগোতে এগোতে আমরা জম্মু-শ্রীনগরের সীমানা বানিহল গিরিবর্ত্মের কাছে হাজির হলাম, পাঞ্জাবের সমতলভূমি এইখানে শেষ হয়ে পাহাড়ের রাজত্ব শুরু হল। পাহাড়ের দেওয়াল বৃত্তাকারে ছড়িয়ে আছে, তার পূর্বদিকের সীমানা মিশে গেছে লাডাক হয়ে হিমালয়ের মধ্যে ; পশ্চিমে তা গিলগিট অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, তার দক্ষিণে জম্মু, উত্তরে শ্রীনগরের উপত্যকা, একশো মাইল লম্বা পঁচিশ মাইল চওড়া এই উপত্যকা পেরিয়ে গেলে আবার অমরনাথ-কোলাহোই-এর পাহাড় শুরু হল, যার কিছুদূরে নঙ্গপর্বত। জম্মু ছাড়বার খানিকক্ষণ পরেই আমরা দেখতে পেলাম আকাশচুম্বী পাহাড়ের প্রাকার, সাধারণত তের চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু। তারই মধ্যে এক জায়গায় পাহাড় সাড়ে ন-হাজার ফুট উঁচু, সেইটুকু বোধ হয় আধ মাইল চওড়াও নয়, তার দুপাশে আবার বরফ-ছড়ানো পাহাড়ের দেওয়াল, তারই মধ্যে ঐ যেটুকু নীচু জায়গা সেইটিই হল বানিহল গিরিবর্ত্ম। সেখান দিয়ে রাস্তাও গিয়েছে, প্লেনও যায়। আমরা বানিহলে প্রবেশ করে দেখলাম দু-ধারে বরফ-ছড়ানো পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে প্রায় সিকি মাইল ফাঁক দিয়ে প্লেন উড়ে আসছে, মাত্র পাঁচশো ফুট নীচে বানিহল পাহাড়ের মাথা। সেখানে যখন আমাদের বায়ুরথ লাফালাফি করছিল তখন সত্য কথা বলতে,

আমি অস্বস্তি বোধ করছিলুম, যা আল্পস পেরোবার সময়ও করি নি কারণ সে প্লেন ছিল বড় ও জোরালো, উড়ছিলুম আল্পসের মাথার পাঁচ ছ-হাজার ফুট উপর দিয়ে, আর অত উঁচুতে কোনও দোলা ছিল না। কিন্তু এখানে প্লেন ছিল ছোট, হাওয়ার ধাক্কায় ঝরা পাতার মত দোলা খায়, তার উপর পর্বতশৃঙ্গের মাত্র পাঁচশো ফুট উপর দিয়ে চলতে চলতে লাফালাফি করছে— এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তিকর নয়। এইভাবে বানিহল পার হয়ে পর্বতপ্রাকারের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা উপত্যকার রাজত্বে প্রবেশ করলুম। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, তার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়, দূরে দিগ্বলয়ে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সারি, নদীনালা বয়ে চলেছে, চেনার ও পপলারের সারি, উপত্যকার চেহারাই অন্য। আমরা এই উপত্যকা দেখতে দেখতে পার হয়ে শ্রীনগরে এসে পড়লাম। বায়ুপোত থেকে নেমে পুলিশের কাছে পারমিট দাখিল করে মোটরে করে শ্রীনগর রওনা হওয়া গেল।

মনে পড়ে, বহুকাল আগে মোটরে করে পুজোর আগে একবার রাঁচি যাচ্ছিলুম, গরমে কাঠ ফাটছে, আমরা আসানসোলে তেল নিতে দাঁড়িয়ে রৌদ্রের ঠেলায় অস্থির, এমন সময় আর একটি রাঁচি-যাত্রী গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। সপরিবারে তাঁরা রাঁচি যাচ্ছিলেন, কয়েকটি ছোট ছেলেও ছিল, বাকী সব যুবকের দল; কর্তাগৃহিণীও আছেন। শুনতে পেলুম গৃহিণী গম্ভীরকণ্ঠে সবাইকে আদেশ করলেন গরম জামা পরে নিতে, ছোট ছেলেরা তো বটেই, যুবকেরা এবং কর্তাও আদেশমত সেই দুপুরে গরম জামা পরে নিলেন—রাঁচি hill-station কি না! তখন মনে মনে হেসেছিলুম। কিন্তু ভাগ্যদেবতাও বোধ হয় সে সময়ে অলক্ষ্যে হেসেছিলেন; তা তখন টের পাই নি, কিন্তু এতদিনে টের পেলুম। কাশ্মীর অর্থাৎ শ্রীনগর সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু, একটা রীতিমত hill-station, কাছেই গুলমার্গ-খিলানমার্গ, যেখানে গ্রীষ্মের সময়ও নাকি স্কি খেলা চলে— সুতরাং ঠাণ্ডা হবেই এরকম ধারণাই ছিল। সেই অনুসারে গরম

জামা-কাপড় চাপিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু শ্রীনগরে নামতেই চক্ষু-স্থির। ঠাণ্ডা কোথায়, এ যে কলকাতার শেষ ফাল্গুন বা প্রথম চৈত্রের মত গরম। প্রখর রৌদ্র, বেশ ঘাম হচ্ছে। প্রথমেই তো এই ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলুম। মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল। থাকগে নাই-বা থাকলো ঠাণ্ডা, সে তো পরশুরামের ভাষায় বরফের চাঙড়ের উপর অয়েলক্লথ পেতে শুয়ে থাকলেই পাওয়া যায়— এখানকার দৃশ্যের সৌন্দর্য দেখেই ও আফশোশটা মিটিয়ে নেওয়া যাবে। মোটর চলল। বিস্তৃত ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ধুলোর রাস্তা, আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড়ও আছে, রাস্তার ধারে চেনার গাছ। ক্রমে আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। করতেই মনে হল, এতদিনে বুঝি ইয়ারো দেখার ফল ফললো, ভূস্বর্গটা কি আমাদের দেখে লুকিয়ে পড়লো? না, আমাদের পাপ চোখে ভূস্বর্গের দর্শন মিলছে না? এ তো দেখছি বহু প্রাচীন শহর— ভাঙা ভাঙা দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বস্তি, অপরিষ্কার গলি, রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন। তারই মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ঝিলম নদীর প্রথম ব্রিজ আমীরকদলের কাছে এসে পড়লাম। ঝিলম নদী চলেছে, জল তার ঘোলা, তারই ধারে মহারাজার পুরানো প্রাসাদ। হাউসবোটে ও অন্য নানারকম বোটে নদী ভরতি। দু-পাশে ভাঙা ঘিন্‌জি শহর। প্রথম দর্শনে মনে হল, কবি কোন কল্পনায় 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' লিখেছিলেন জানি নে, কিন্তু আসলে এ তো আমাদের প্রায় টালার খালের ব্যাপার! ঐ রকমই ঘোলা জল, ঐ রকমই ঠাসাই নৌকা। অবশ্য চওড়ায় টালার খালের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় আড়াই তিন গুণ, স্রোতও অবশ্য খুব প্রখর। কিন্তু তফাৎটা আকারের যতই হোক্ না কেন, প্রকারে কতখানি? যদি কেউ মনে করে নিতে পারেন যে, টালার খালটা তিন গুণ চওড়া হয়ে গিয়েছে, তীরে আম কাঁঠাল বটগাছের বদলে চেনার-পপলারের সারি, পাটের নৌকার বদলে হাউস বোট আর শাকসব্জীর বোট তা হলেই ঝিলম নদীর রূপ তার চোখে পড়তে বাধা কি? তাছাড়া

শহর! সেই ছোট ছোট খুপ্রি খুপ্রি ভাঙা বাড়ী, ধুলো ময়লা নোংরা ভরতি পথঘাট, অসহ্য দুর্গন্ধ গলিপথ আর নোংরা আলখাল্লা-পরা লোকজন, অপরিচ্ছন্নতায় এরা ভারতীয় শহরের নোংরামির সনাতন ও নৈষ্ঠিক আদর্শ বজায় রেখেছে। কাশ্মীরের তিনটি বিষয়ে ভারতে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে এই বিষয়টিতেও তাদের স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ অন্তর্ভুক্তি আছে একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। আর লোকজন? সাধারণত পর্বতবাসীদের যা হয়ে থাকে তাই-ই, সুতী গরম অনেকগুলি জামা এরা পর পর পরে থাকে, তার উপর মাথায় পরে তাজ কিংবা পাগড়ী এবং তা কখনও খোলে না, ফলে নানা রকম পোকামাকড়কে এরা অঙ্গের ভূষণ করে তো রেখেছেই, উপরন্তু, শিরোধার্য করে রেখেছে। তার উপর, শুনলাম, শীতকালে এরা জামাকাপড়ের মধ্যে পেটের উপর ঝোলায় কাংড়ি অর্থাৎ অগ্নিপাত্র, জ্বলন্ত কয়লায় ভরা ছোট ছোট আংটার মত চেন দিয়ে গলা থেকে ঝোলানো থাকে, তাতে শীতনিবারণ হয় সত্য, কিন্তু দেহের ঐখানটায় তাপ লেগে লেগে পুড়ে যাওয়াব মত হয়, কেউ কেউ বলেন, অনেক সময় ক্যান্সারও নাকি হয় ঐ কারণে। আর ছোট ছোট ছেলেদের কাংড়ি থেকে আগুন লেগে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছে এরকম দুর্ঘটনা শীতকালে খুব সাধারণ। যাই হোক্, প্রথম দর্শনে এই সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এমন চমক লেগে গেল যে, আমাদের সকলের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল, কোনখানটা একটু একটু ভূস্বর্গ ভূস্বর্গ মনে হচ্ছে তা কে আগে খুঁজে বার করতে পারে। কিন্তু এতেও শেষ নয়, ওস্তাদের মার শেষ বেলায়। আমরা নেডুর হোটেলে গিয়ে উঠলাম, আমাদের সবচেয়ে চমক সেই হোটেলেই লাগিয়ে দিল; এই সেই বিখ্যাত নেডুর হোটেল, শুনেছি নাকি স্বেন হেডিনের না অরেল স্টীনের রচনাতেও এর তারিফ আছে, এ হল ভূস্বর্গেরও স্বর্গ, শ্রীনগরের শ্রেষ্ঠ হোটেল, তার শেষকালে এই রূপ? মধ্যে একটি দোতলা বাড়ী, বহু পুরোনো তার আদল, একালের আদর্শে

শঙ্করাচার্যের মন্দির, রাত্রে সে মন্দিরচূড়ায় আজও প্রত্যহ আলো দেয়, তারাখচিত মহাকাশের সুগম্ভীর শান্তির নীচে রজতসন্নিভ মহাদেব পাহাড়ের সামনে সে আলোর শিখা আজও অমলিন জ্বলে। সেই যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কত পটবদল হয়েছে, কিন্তু সেই মহারহস্যের আকর্ষণে অগণিত মানুষ এই পথের যাত্রী হয়েছে। আরও এক দিব্য দীপ্ত সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে। এঁরও তো চল্লিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ হয়েছিল, কিন্তু তারই মধ্যে ইনিও কী অমিত তেজে সারা ভারতকে মথিত করে গিয়েছেন, এমনকি য়ুরোপ আমেরিকাতেও তুলেছেন তরঙ্গ। সেই অদ্বৈত-পন্থার নবতম পথিক বিবেকানন্দও তো এই প্রত্যন্ত সীমায় এসে ক্ষীরভবানী অমরনাথ দর্শন করে গিয়েছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আরও কত মহাপথিক এই পথের যাত্রী হয়েছেন, এখানে কত তান্ত্রিক শৈব-উপাসনার ছাপ রয়ে গিয়েছে। তেমনি ইতিহাসের কথাও মনে আসে। অশোক কুশানের পর কতকাল কেটে গেল, দিল্লীতে পট পরিবর্তন ঘটেছে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। সম্রাটশিল্পী শাহজাহান আগ্রার কেল্লা রচনা করেছেন, তাজমহল গড়ে উঠছে, তারপর গড়ে উঠল দিল্লীর লালকেল্লা, তাতে রূপালি চাঁদোয়া মতির ঝালর, দেওয়ানি খাসে মণিমুক্তার ঝলক, তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নহর-ই-বেহেস্ত, গোলাপ জলের ফোয়ারা, মর্মরপ্রাঙ্গণে নর্তকীদের নৃত্যভঙ্গী শীশমহলের হাজারো আয়নায় ঝল্‌কে উঠছে, ময়ূর সিংহাসনে বসেছেন শাহান শাহ্, ফুলের গন্ধে আতরের সুবাসে বাতাস ভারি, সত্যই মনে হয়—

অগর ফির্‌দোস্ বররূয়ে জমিনস্ত্।
হমিনস্ত্ উয়ো হমিনস্ত্ উয়ো হমিনস্ত্॥

সেই শাহজাহান চললেন কাশ্মীরে, গড়ে উঠল ডাল লেকের পাশে পাশে অপূর্ব বাগান, শালিমার নিশাতবাগ চশমাশাহী। সুনীল মানসবল হ্রদের উপর রোশেনারা রচনা করলেন তাঁর নিভৃত স্নানের নিকেতন— ঝরোখা। আজ সেই ঝরোখা আর নেই,

আচ্ছাবলে নূরজাহানের হামাম ভেঙে পড়েছে, কিন্তু গন্ধভারে ভারি বাতাস আজও শালিমার নিশাতবাগে সেই অতীত যুগের সৌরভের রেশ বহন করে।

এখানে এসে আরও একটা জিনিস খুব চোখে পড়ছে। দার্জিলিং বা তার ভিতরে পাহাড়ে গেলে চোখে পড়ে মহাচীনের ছায়া— স্থাপত্যে, পোষাকে, দেহ-গঠনে, আর হিমালয়ের এই সীমায় এলে চোখে পড়ে মধ্য এশিয়ার ছায়া। মোগল সাম্রাজ্যও যখন সুদূরভবিষ্যতের গর্ভে সেই সুপ্রাচীন অতীতেও ব্যাবসা চলত তাশকন্দ-ইয়ারকন্দ-খোটান থেকে পাহাড় পার হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। ঝিলম নদীর সপ্তম ব্রিজের কাছে শ্রীনগরে ইয়ারকন্দি সেরাই আছে, ইয়ারকন্দের ব্যবসাদারেরা প্রতি বছর ব্যবসা করতে এসে সেইখানে আশ্রয় নিত। কাশ্মীরে এই যে ক-বছর লড়াই চলছে মাত্র সে ক-বছর তারা আসে নি। কিন্তু কাশ্মীরের বিখ্যাত চেনার গাছ হল পারস্যের আদিম অধিবাসী, সেখান থেকে এদেশে তা আমদানী হয়েছে। সেইরকম লতানো গোলাপবীথির তলা দিয়ে কুঞ্জবনের পাদচারণাপথ। আর তেমনি ফলের প্রাচুর্য। শিল্পকর্মে স্থাপত্যে গালিচার কাজে ভারতীয় রূপরেখার ধারে ধারে বয়ে চলেছে মধ্য এশিয়ার, বিশেষত ইরাণের ধারা। মহাভারত-কথার এও তো একটা অংশ— যার মধ্যে অঙ্গীকৃত ও অঙ্গীভূত হয়ে আছে এশিয়ার ছায়া, চীন হতে ইরাণ পর্যন্ত। আজ হয়তো আমাদের জীবনে এই বিরাট ইতিহাসের পরিব্যাপ্তি নেই। কিন্তু যখন সেই সীমানা ছাড়িয়ে এই বিরাট ইতিহাসের ক্ষণিক দর্শনও আমরা পাই তখন তার বিরাট ঐতিহ্যভার ও ব্যাপক আহ্বান রোমাঞ্চিত বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করি।

॥ তিন ॥

একদিন আমরা শিকারা অর্থাৎ পানসির মত ছোট নৌকা চড়ে ঝিলম নদী দিয়ে শহরের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। শিকারা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। ঐ নৌকাগুলি অত্যন্ত নীচু এবং লম্বা ; মাথার উপরে চিকণপাটির মত পাটী দেওয়া ছাদ, তার তলায় কারুকাজ করা ঝালর, দুপাশে পর্দা ঝোলানো। বসবার আসনটিও কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে মোড়া। প্রমোদযাত্রীরা আরামে গা হেলিয়ে বসেন, রৌদ্র থাকলে পর্দা টেনে দেন, দু-তিনজন দাঁড়ি পানপাতার মত ছোট ছোট দাঁড় ঝপাঝপ জলে ফেলে নৌকা চালায়। শিকারায় চড়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলাম। শহরেব মধ্যে নদীর উপর সাতটা ব্রিজ আছে ; আজকাল ফার্স্ট ব্রিজ সেকেণ্ড ব্রিজ বলে, কিন্তু ওদেশী ভাষায় ওদের আলাদা নাম আছে। যথা — আমীরকদল, হাবাকদল, খেলকদল ইত্যাদি। শেষে নদীর উপর একটা লক্ (lock) আছে, সেই লকের উপর দিয়ে মাছ লাফিয়ে পড়ে লক পার হয়। ঝিলম নদীতে জল বাড়লে একটি ক্যানালের মধ্যে বাড়তি জল টেনে নেওয়া হয়, ঝিলমের জল কম থাকলে এই লক বন্ধ করে জল বাড়ানো হয় নৌকা চলাচল ঠিক রাখবার জন্যে। ঝিলমের তীরে প্রথম ব্রিজের কাছেই মহারাজাব পুরানো প্রাসাদ। তার পাশে রানীমহল, তারই পাশ থেকে ক্যানালের উৎপত্তি। লকের কাছে গিয়ে সে ক্যানাল আবার ঝিলমে মিশেছে। মহারাজার পুরানো প্রাসাদের এক কোণে নদীর উপর স্বর্ণচূড় শিবমন্দির ; এক-একটা ব্রিজের কাছে নানা রকমের দোকান, শালের দোকান, কাঠের দোকান ইত্যাদি। তাছাড়া ঘন বসতি। পুরানো দোতলা,

তেতলা বাড়ি, অনেক বাড়িতে কাঠের জালিকাজ আছে, অসম্ভব ছোট ছোট আলো-বাতাসহীন ঘর, অত্যন্ত ছোট ছোট গলি-গলি রাস্তা।

মেঘদূতের মেঘ যখন উত্তরাপথে যাত্রা করেছিল, তখন যক্ষ তাকে বলেছিল, সে হিমালয়ে পৌঁছে দেখতে পাবে, নদীতীরে অলকাপুরী। তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্। পাহাড়ের গায়ে অলকাপুরী কেমন দেখায়? প্রণয়ীর কোলে প্রণয়িনী যেমন স্রস্তবাসা হয়ে শায়িত থাকে, তেমনই পাহাড়ের কোলে সেই পুরী শায়িত আছে, গঙ্গাটি যেন তার স্রস্তবাস। সেই পুরীর ঐশ্বর্য-বর্ণনায় কালিদাসের কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে— কত অভ্রংলিহ প্রাসাদ, কত ভরনশিখী, কত মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি, কত স্ফটিকের অলিন্দ!

এই যে শ্রীনগর নামক পুরীটি, এটিও পাহাড়ের গায়ে এলিয়ে রয়েছে, এরও তলা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, চার পাশে বরফ-ঢাকা পাহাড়, ঠিক একেবারে তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্। কালিদাসের মেঘ এই পথে যাত্রা করেছিল কি না জানি নে, কিন্তু একথা ঠিক যে, এই শহরটি নিশ্চয়ই অলকাপুরী ছিল না।

কথাটা খুলে বলি ; শিকারা তো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে প্রথম ব্রিজের তলা দিয়ে মহারাজার পুরানো প্রাসাদের সামনে এল : দুপাশে ঘন বসতিও শুরু হল ; ঝিলমের জল ঘোলা, শহরের সমস্ত ড্রেন নদীর জলে পড়ছে, সমস্ত আবর্জনা জলে ভাসছে, চার পাশে অজস্র শিকারা, স্থানীয় লোকের বসবাসের বোট, মালের নৌকা। চার পাশে কল্পনাতীত অপরিচ্ছন্নতা। শুনলাম নাকি পূর্বে আরও নোংরা ছিল, শেখ আবদুল্লার আমলে নাকি কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। অথচ অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে নির্বিকার। দিব্যি সকলে সেই জলে হাত-পা ধুচ্ছে, অনেকে স্নানও করছে, সেই জলে রান্নাবান্না হচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রায় স্রস্তবাস হয়ে স্নান করছে, বিশেষত পুরুষেরা, সামান্য আব্রুর জন্য কোথায়ও কোথায়ও নদীর কিনারে জলের মধ্যে কাঠের ঘরের মত করা আছে,

তাব মধ্যে অনেক সময় স্নানকর্মটুকু সমাধা হয়ে থাকে। কিন্তু নগ্নাবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে কাপড়-চোপড় পরতে এদের কোন দ্বিধা নেই। নদী দিয়ে শিকাবায় পুরুষ মহিলা যিনিই যান না কেন, আশেপাশে স্ত্রী-পুরুষ যাই থাক না কেন, সে বিষয়ে এদের কোন দৃকপাত নেই ; আমরা ক্রমে ঝিলম ত্যাগ করে ক্যানালে ঢুকলাম। এখানে জলের স্রোত খুব কম ; ড্রেনের সংখ্যা আরও বেশি, জলে বেশ দুর্গন্ধ। দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে ; অনেকগুলির ঘাট একেবাবে জল পর্যন্ত নেমেছে, খানিকটা কাশীব মত দেখতে। আশেপাশে ময়লা জলের ধারা, এমনকি, ঘাটের সিঁড়ি বেয়েও অজস্র ময়লা জল ও আবর্জনা গড়াচ্ছে অথচ এবা তারই মধ্যে পরম নির্বিকারচিত্তে হাত-পা ধুচ্ছে, স্নানও করছে, বাসন মাজছে, রান্নাবান্না কবছে। আশেপাশের দেওয়াল ফুটো করে ড্রেনের পাইপের মুখ বেবিয়ে আছে, ময়লা জল ঝরছে ক্যানালের উপর ; অসাবধানে শিকাবা চালালে সেই ময়লা জল শিকাবার উপর পড়বে ; হায় হায়, এব নাম ভূস্বর্গ! দিলীপ বায় ঠিকই লিখেছেন, কাশ্মীর সম্বন্ধে— হাইজিন আব বিউটি এক বস্তু নয়।

আমবা ক্যানালটি তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে আবাব ঝিলম নদীতে এসে পৌছলাম. এখানে ঝিলম নদীর দুববস্থা অতখানি না হলে হবে কি, তারও জল কম নোংরা নয়, দুর্গন্ধ থেকেও একেবারে মুক্ত নয়। আমরা একে একে ব্রিজগুলি পার হতে লাগলাম। ব্রিজ বোধ হয় পাকা কোনটিই নয়, প্রথমটি ছাড়া, অধিকাংশই কাঠের ট্রেসলের (Tressle) উপর ; থামের মত করে কাঠ সাজানো হয়েছে। বেশ মজবুত, উপর দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া সবই চলে, দু-একটি বাদে। নদীর দু পাশে বাড়ির সারি চলেছে, কোনটি দোতলা, কোনটি তেতলা ; অবশ্য কোনটিই আমাদের ধারণামত দোতলা-তেতলা নয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। নদীতে সার সার নৌকা বাঁধা। ধারে কোথায়ও দু-একটা মন্দির-মসজিদও চোখে পড়ে। ওদেশেব ভাষায় সবই জিয়ারৎ— হিন্দু জিয়ারৎ আর মুসলমান জিয়ারৎ।

এখানে ভেদবুদ্ধির সূচনা দেখেছি বটে, কিন্তু তা এখনও প্রবল হয়ে ওঠে নি— সেইজন্য দুই-ই জিয়ারৎ। এই নদীর ধারেই সবচেয়ে বড় মসজিদ, ওখানকার জামে মসজিদ— তার নাম শাহ্-ই-হামদান। মসজিদের চিরাচরিত স্থাপত্যরীতিতে গড়া নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, এর ছাদে মাটি চাপানো। শোনা যায়, এই মসজিদের গর্ভগৃহ থেকে একটি ঝরনা বেড়িয়েছে; সেই ঝরনা নাকি কালীকে উৎসর্গীকৃত। সেই ঝরনা শাহ্-ই-হামদান থেকে বেরিয়ে পাশেই একটি মন্দিরে প্রবেশ করেছে— মন্দিরটি হিন্দুদের জিয়ারৎ, শাহ্-ই-হামদানের একেবারে লাগোয়া।

এবার ডাল লেকের কথা বলি, সেই সুবিখ্যাত ডাল লেক। শ্রীনগর শহর থেকে ডাল লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যাবে, বাঁ হাতে হরিপর্বত হতে শুরু করে মধ্যে মহাদেব পর্বতমালা হয়ে পরীমহল ও গুলাপবাগ হয়ে পর্বত রেখাটি তখৎ-ই-সুলেমান অথবা শঙ্করাচার্য পর্বতে বৃত্তাকারে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়, কেবল মহাদেব পর্বতের মাথায় সামান্য কিছু বরফের রেখা গ্রীষ্মকালেও থাকে, স্কুলের ছেলেরা একদিনেই চড়ে ফিরে আসে। এই পাহাড়ের কোলের মধ্যে ডাল লেক। লেকটি পাঁচ মাইল লম্বা, দু মাইল চওড়া। লেকটি প্রায় তিন ভাগ; ডাল গেট দিয়ে প্রবেশ করে প্রথম অংশের নাম গাগ্‌বিবাল। এখানটা হাউস-বোটে ভরতি। গাগবিবালের সীমানায় একটি ছোট দ্বীপ আছে, সেখানে বসবার জায়গা আছে, সামনে সাঁতারের আড্ডা, বিভিন্ন জলকেলিরও ব্যবস্থা আছে; তারপর শুরু হল বড় ডাল; ওপার থেকে দুটি রাস্তা ডাল ভেদ করে শহর পর্যন্ত গিয়েছে, বড় ডাল এই দুই অংশে বিভক্ত। মধ্যে ছোট একটি দ্বীপ আছে, তাতে চারটি চেনার গাছ আছে, সেজন্য দ্বীপটির নাম চার-চেনারী; আর একটি ছোট দ্বীপে পায়রা বসবার জন্য একটি ছোট ঘর আছে, দ্বীপটির নাম কবুতরখানা। লেকের ডান ধারের পাহাড়— অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের ওপাশ দিয়ে ঝিলম বয়ে যাচ্ছে— ঐ পাহাড়ের এপাশে লেক,

ওপাশে নদী। লেক থেকে একটি খাল কেটে ঝিলমের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে, জলের লেভেলের তারতম্য থাকায় ডাল লেক ও খালের সংযোগস্থলে একটা লক আছে ; খালটি কিছু দূরে এসে ঝিলমে পড়েছে ; সেখানে খালের উপর একটি গেট আছে। তারই নাম ডালগেট। ঝিলমের জল বাড়লে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে নদীর জল লেকে না ঢুকতে পারে। আবার যদি কোন সময় লেকের জল বেশি বাড়ে এবং ঝিলমের জল নীচু থাকে—স্বাভাবিকতঃ তাই থাকে—তাহলে খাল দিয়ে হ্রদের জল নদীপথে বেরিয়ে যায়।

কাশ্মীরে এসে শ্রীনগরের শ্রীতে মুগ্ধ না হলেও ডাল লেক সহজেই মন কেড়ে নেয় ; কালো জলে হাওয়ায় ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে, ডানামেলা পাখীর মত শিকারা চলেছে, চার পাশে পাহাড়ের বেষ্টনী, ঝির ঝির করে বাতাস বইছে— এখানকার শোভা অপূর্ব। এই ডাল লেকেরই ধারে ধারে বাদশাহী বাগানগুলি, চশমাশাহী, নিশাতবাগ ও শালিমার। তিনটিই শাহজাহানের তৈরি। চশমা-শাহী হল সবচেয়ে ছোট, দুই থাকে বাগান। উপরের থাকে পাহাড়ের গা থেকে একটি হিমশীতল ঝরনা বেরিয়ে আসছে ; ঝরনার উৎসমুখ পাথরের জালিকাজ দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে সে জলের ধারা উপছে পড়ে সামনে চলেছে, সেই ধারা আর এক ধাপ লাফিয়ে পড়ে পরের ধাপে নেমেছে, সেখান থেকে তা ডাল লেকের দিকে চলে গিয়েছে। চার পাশে সুদৃশ্য চেনার ও ঝাউ, মাধবী লতার মত কি একটা যেন লতা, আর চার পাশে ফোয়ারা। প্রতি রবিবার ফোয়ারা ছেড়ে দেয়, তখন এ-বাগানের শোভা অপূর্ব। এই ঝরনার জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই নাকি স্বাস্থ্যপ্রদ। চশমাশাহীর পাশেই একটি গেস্ট হাউস আছে কাশ্মীর সরকারের ; পণ্ডিত নেহরু এলে নাকি তাঁকে ঐখানে রাখা হয়। সামনে ডাল লেক, পিছনে পাহাড়, পাশে ঝরনা ও বাগান— জায়গাটি মনোরম।

ডাল লেকের কিনারা ধরে আর একটু অগ্রসর হলেই নিশাত-

বাগে উপস্থিত হওয়া যায়, ঐ বাগানটি শালিমারের মত অত বড় না হলেও আয়তনে মন্দ নয়; কিন্তু শালিমারের চেয়েও এক হিসেবে এ-বাগানটি আরও চমৎকার। শালিমার বাগানটির দুই কি তিন থাক আছে; থাকগুলিও বেশি উঁচু নয়। কিন্তু নিশাতবাগ আরও খাড়া পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয়েছে। সেইজন্য পাহাড়ের কোল হতে ডাল লেকের তীর পর্যন্ত বহু থাকে ক্রমশ ক্রমশ বাগানটি নেমে এসেছে। প্রত্যেক থাকটি বাঁধানো, সিঁড়ি আছে। শাহ-জাহানের প্রিয় জিনিস ছিল ঝরনা, উপর থেকে থাকে থাকে ঝরনা নেমে আসছে, তাতে অজস্র ফোয়ারা। থাকগুলির উপর দিয়ে ঝরনা গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে দেওয়ালের গায়ের পাথর ঢেউ খেলানো করে কাটা, তার উপর দিয়ে সামান্য জল পড়লেও ভ্রম হয়, কুলকুল করে ঢেউ চলছে বুঝি। ফুলের বাহার নিশাতবাগে অজস্র, কিন্তু তার চেয়েও নজরে পড়ে ফলের বাহার। জুন মাসে ফল পাকে না, কিন্তু তখন গাছে গাছে ফুল এসেছে। আনার গাছে আনারকলি জ্বলন্ত লাল রঙের ফোয়ারা ছড়িয়েছে, অন্যান্য ফলের গাছে ছোট ছোট ফল ধরেছে, তার গন্ধে বাতাস ভারি। একেবারে মৌ-মৌ করছে। চার পাশে গাছের ঘন ছায়া, ঝরনা চলেছে তার মধ্যে মধ্যে, ফুলেরা রঙের অজস্রতায় চার দিকে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে, বাতাস গন্ধমন্থর— মনে হল, এই রকম সুখের নিবিড় বেদনাতেই কোনও সময় কীটস লিখেছিলেন :—

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk ;

শালিমারের খ্যাতি আরও বেশি হলেও আমার মতে নিশাতের চেয়ে বেশি সুন্দর নয়, অবশ্য শালিমার অনেক বড়, অত চড়াইও নয়। পাহাড়ের সীমানা থেকে ঝরনা আসছে, প্রথমেই বসবার

জন্য একটি ঘর। সেই ঘরের মেঝের উপর দিয়ে জল চলেছে, ধার দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নীচে, সেখান থেকে আবার বাঁধা খাতে প্রবাহিত হল সামনে। মধ্যে অজস্র ফোয়ারা, আবার একটি বসবার ঘর ; আবার জল লাফিয়ে নামল এক থাক ; আবার সামনে ঐরকম ফোয়ারার খেলা। এইভাবে বাগান শেষ হল ডাল লেকের কিনারায় এসে। শাহজাহানের নেশাই ছিল জলের খেলা আর ফুলের মেলা। দিল্লীর লালকেল্লা দেখলেও তা বোঝা যায় ; ঘরে ঘরে চলেছে নহর-ই-বেহেস্ত, হাজারো ফোয়ারার মর্মর মুখ, হামামে ঢেউ-কাটা মর্মরে জল চললে এখনও চোখের ভুল হয়, মনে হয় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে নাকি ; এখন আর সেখানে ফুল নেই। কিন্তু কাশ্মীরের এই বাগানগুলি দেখলে কিছুটা কল্পনা করতে পারা যায়, শাহজাহান-পরিকল্পিত জলের খেলা আর ফুলের মেলার অপরূপ সৌন্দর্য।

শালিমার ছাড়াও আরও কয়েকটি বাগান কাছকাছি আছে। তার মধ্যে শালিমার হতে আরও কিছু দূরে হরবন্‌স্ বাগান আছে। এটি খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। একটি নদীকে বেঁধে ছোট জলাশয় করা হয়েছে ; এখান থেকে শ্রীনগরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এর কাছেই সরকার চালিত একটি ট্রাউট-মাছ-পরিবর্ধন কেন্দ্র আছে। এখানে নানা রঙের ও নানা বয়সের ট্রাউট-মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার রক্ষকদের বললে কুচো কুচো মাছ তারা ছুঁড়ে দেয়, এক-একটা চৌবাচ্চায় শত শত ট্রাউট লাফিয়ে তীরবেগে ছোটে সেই কুচো মাছ ধরবার জন্য— দৃশ্যটি বেশ। এই সব ট্রাউট-পোনা পাঞ্জাব এবং অন্যত্র বিক্রি করা হয় মাছের চাষ করবার জন্য। হরবন্‌স্ ছাড়া এ অঞ্চলে আরও একটি বাগান আছে ডাল লেকের অন্য কোণায়, তার নাম নিশাতবাগ।

শ্রীনগরের শ্রী সমস্তই এই অঞ্চলটিতে জড় হয়েছে। হমিনস্ত্, উয়ো হমিনস্ত্ উয়ো হমিনস্ত্। শালিমার বা নিশাতবাগে দাঁড়িয়ে দেখি, চার দিকে গোল পাহাড়রেখা, তার পিছনে দূরে বহুদূরে আর

একটা বরফ-ঢাকা পাহাড়সারি, মধ্যে লেক, নৌকা চলছে, এ দৃশ্য কার না মন ভোলায়?

কাশ্মীরের দৃশ্য এক হিসেবে অনন্য। শিলং, দার্জিলিং বা কুমায়ুন— এসব জায়গার সৌন্দর্য নিতান্ত পাহাড়ের সৌন্দর্য; আমরা সমতলের লোক, দার্জিলিং গিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর পাহাড়, সমতল থেকে যেন সিধে উঠে গিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত। সেই পাহাড়ের গায়ে শহরটা এখানে ওখানে ঝুলছে, অবিরাম মেঘের আসা-যাওয়া, তার চেহারাটাই অন্য রকম। কিন্তু কাশ্মীরে এরকমটি নয়। দূরে দিক্‌চক্রবালে বরফঢাকা পাহাড়ের সারি, কিন্তু মধ্যে অনন্ত বিস্তৃত সমতল মাঠ, ধান চাষ হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে আবার ছোট ছোট পাহাড়ের চক্র, তার মধ্যে হ্রদ। আবার কোথায়ও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী চলেছে, কোথায়ও সে নদী ঝিলমেব মত বাঁকে বাঁকে বয়ে চলেছে; কোথায়ও আবার সে লিডাব নদীর মত খরস্রোতে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে গর্জন করতে করতে চলেছে। উঁচু পাহাড়ের মধ্যে গেলে পৌছন যায় বরফের বাজত্বে, সেখানে আর সমতলের চিহ্ন নেই। এমন বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে এমন সৌন্দর্য অন্য কোথায়ও মেলে না। আমার তো মনে হয়, কাশ্মীর হল এদেশে য়ুরোপীয় পার্বত্য সৌন্দর্যের নিকটতম সংস্করণ, বিশেষ করে সুইট্‌জরলণ্ডের ছোট পাহাড়, উঁচু বরফ ঢাকা পাহাড়, নদী, হ্রদের তেমনই সমন্বয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এল। প্রকৃতি তো অকৃপণ হাতে দু-জায়গাতেই প্রায় একই ধরনেব সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন কিন্তু তাব উপর আবার মানুষ চেষ্টা করে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। এখানে, স্বীকার করতেই হবে, য়ুরোপ কাশ্মীরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যেমন জেনিভা বা জ্যুরিখ্ শহরের কথা ধরা যেতে পারে। শ্রীনগরের মত জ্যুরিখও একটি নদীর (লিমাৎ নদীর) দুপাশে গড়ে উঠেছে, সে নদীটি শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে জ্যুরিখ হ্রদে। লিমাৎ নদী ঝিলমের চেয়ে চওড়ায় কমই হবে, কিন্তু নদীর

ধার কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিরকম সাজসজ্জা, হ্রদে অত্যাধুনিক মোটর নৌকা, দুপাশে নানারকম দোকান, পথের ধারে কফি-পানের আড্ডা। অথবা, জেনিভা। রোন নদী জেনিভা লেকের একদিক দিয়ে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই বার হবার মুখেই জেনিভা শহর লেকের দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, নদীর দুপাশেও, প্রকৃতির কারুকাজ কাশ্মীরের মতই। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের কারুকাজ। লেকের যেখান থেকে রোন নদী বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে লেকের দুপাশ বাঁধানো, তার পাশে কেয়ারি করা অপূর্ব বাগান, রঙীন ফুলের সারি দিয়ে নানা দেশের পতাকা বা রাষ্ট্রীয় চিহ্ন করা রয়েছে, লেকের মধ্যে দু'টি দেওয়াল যেন বাহুপ্রসার করে রয়েছে, সেই বাহুর একটিতে প্রসিদ্ধ ফোয়ারা, জল ওঠে অক্‌টরলনি মনুমেণ্টের সমান উঁচু হয়ে, রোন নদীর উপরে নানা ব্রিজ, প্রথম ব্রিজের (মঁ ব্লঁ ব্রিজ, Pont du Mont- Blanc) পাশে রুশো দ্বীপ (Ile Rousseau) নামে ঘনছায়া একটি ছোট দ্বীপ, ওপারে ইংরেজ বাগান (Jardin Anglais), নানা রঙের ফুলের সমারোহে ছেয়ে আছে, লেকের ধারে লাল টেবিল চেয়ারের ছোট ছোট রঙীন ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বালিয়ে আইসক্রীম কফি-পানের আয়োজন, এক পাশে ক্যাসিনোতে নৃত্যগীতের আড্ডা, রাত্রে সমস্ত হ্রদের তীর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ঝকঝক করছে, সার্চলাইটের আলো সেই ফোয়ারার উপর পড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছে, হ্রদে স্টীমার চলছে, স্নান সাঁতার স্পীডবোটের আড্ডা, দূরে মঁ ব্লঁ-র (Mont Blanc, 'শাদা পাহাড়'— য়ুরোপের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ) শ্বেত শিখর— মন একেবারে চমৎকৃত হয়ে যায়। প্রকৃতিকে তারা এমনই করে সাজিয়েছে যে, তার সৌন্দর্য অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ভারতীয় মনের সঙ্গে য়ুরোপীয় মনের মৌলিক পার্থক্যটি ধরা পড়ে। ভারতবর্ষ প্রকৃতিকে পূজা করেছে, তার সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেছে, য়ুরোপ প্রকৃতিকে মানুষের ক্রীড়াভূমি ছাড়া আর কিছু ভাবে নি। রুটলেজ সাহেবের ভাষায়,

সেই জন্য, আল্পস হল মানুষের ক্রীড়াভূমি, হিমালয় দেবতাদের। য়ুরোপীয় মনের এই ধারাটিই ওদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টায়। বার্টাণ্ড রাসেলের কথায়, সে মানুষ প্রথমে চেয়েছিল প্রকৃতির আঘাত থেকে বাঁচতে, তখন সংগ্রাম ছিল প্রকৃতি আর মানুষে। কিন্তু যেই একবার সে প্রকৃতিকে বশ করতে শিখল অমনিই সেই শক্তিকে সে প্রয়োগ করল মানুষের বিরুদ্ধে। রাসেল তাই বলেছেন, যে মানুষের হিতবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় নি সে মানুষের হাতে এই অসীম ক্ষমতা এসে পড়াতেই জগতের এই দুর্দশা ; সেইজন্য এখন প্রয়োজন হয়েছে মানুষের নিজের অন্তরের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হবার। অর্থাৎ হিতবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা চাই। কিন্তু তা বলে ভারতবর্ষেরও আনন্দ করার কিছু নেই ; যে যুগে আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করবার চেষ্টা করতাম সে যুগ বা সে সাধনা বহুকাল গত, তার ফলে এখন আমাদের মন নিছক নিষ্ক্রিয়তার পঙ্কে ডুবে গিয়েছে, এমনকি সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনও আমরা আর অনুভব করি না। তা না হলে ভিতরে বাহিরে স্তূপীকৃত আবর্জনা সরাবার তাগিদও মনে আসে না কেন ?

॥ চার ॥

আমরা হোটেল ছেড়ে হাউসবোটে চলে এসেছি। হাউসবোটে থাকলে কাশ্মীরীদের জীবনযাত্রার একটা বিচিত্র আস্বাদ পাওয়া যায়, যা হোটেলে পাওয়া যায় না। হোটেল হল ইংরেজী কায়দার জিনিস, ব্যবসায়ী বুদ্ধি সেখানে বেড়া তুলে রেখেছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষ, শুধু ভারতবর্ষ কেন, প্রাচ্যই বলি— আর পাশ্চাত্যদেশের তফাৎই এই। প্রাচ্যের দুয়ার সব সময় খোলা। বাড়ীর দরজা কদাচিৎ বন্ধ হয়। রোয়াকে বসে আড্ডা জমে, গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর সামনে মাচার উপর পথচলতি মানুষ সহজেই এসে দুদণ্ড তামাক খেয়ে খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে যেতে পারে। বাড়ীর মধ্যে ঘরে ঘরে দরজা কখনই বন্ধ থাকে না। বাড়ীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বচ্ছন্দেই 'কই মশায়, কোথায় গেলেন গো' বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে। আজকাল অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম হচ্ছে বটে, কিন্তু মোটের উপর এখনও একথা সত্য। পাশ্চাত্যে এসব হবার উপায় নেই। কি হোটেলে, কি বাড়ীতে প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ, অনেক ক্ষেত্রে আবার ডবল দরজা, ঢুকতে হলে প্রথমে দরজা ঠক্‌ঠক্ করতে হবে, ভিতর থেকে অনুমতি পেলে তবে ঘরে ঢোকা যেতে পারে। নিকটতম আত্মীয়ের বেলাও এর ব্যতিক্রম নেই, এমনকি, এক পরিবারের মধ্যেও। অকারণে এসে আড্ডা জমাবার স্বভাবও সঙ্কীর্ণ— অন্তত পিয়ানো, তাস বা এইরকম একটা কিছু উপলক্ষ হলে ভাল হয়। প্রাচ্যে এর উল্‌টো।

হাউসবোটে এলে প্রাচ্যের এই রূপটি অনুভব করতেই হয়।

হোটেলে কারবারীদের ঢোকা মানা, কিন্তু হাউসবোটে অন্য ব্যাপার। যেহেতু আপনি কাশ্মীরে এসেছেন এবং হাউসবোটে আছেন, সে হিসেবে তারা আপনার কাছে নানা ধরনের জিনিস নিয়ে আসবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনাকে বিরক্ত করবে, আপনিও সেসব জিনিস দেখবেন এবং সাধ্যমত কিনবেন— এতে যেন তাদের একটা অদৃশ্য অধিকার রয়ে গেছে। পাথরওয়ালা, রুপোর জিনিসের কারিগর, ফুলওয়ালা ফলওয়ালা, কাঠের কাজের কারিগর, শালওয়ালা অবিরত শিকারা চড়ে আসছে— শেষ পর্যন্ত তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। এখন এটা প্রায় অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এর পিছনে নিছক ব্যবসাদারী ছাড়া ঐরকম একটা মনোভঙ্গীও আছে। কারণ, এমন দু-চারজন শালওয়ালাও অন্তত দেখেছি, যারা, যদি বোঝে যে আপনি সমঝদার ব্যক্তি, তাহলে জিনিস বিক্রির চেষ্টার বদলে আপনাকে ভাল কারুকার্য দেখাবার জন্য তাদের আন্তরিক আগ্রহ হয়, আপনি সে জিনিস কিনুন আর নাই কিনুন তার জন্য সে আর মোটেই ব্যস্ত থাকে না। এ আগ্রহ অবশ্য খুব বেশী নেই, তবু এর চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। সেইজন্যই হাউসবোটে বসে ওখানকার শিল্পকাজের নমুনা দেখবার এত সুযোগ মেলে, নানা ধরনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশবার ও কথা কইবার উপলক্ষ হয়, চোখের সামনে এতরকমের বিচিত্র চলচ্ছবি ঘটতে থাকে যা ফ্যাশনশাসনবদ্ধ কেতাদুরস্ত হোটেলে সম্ভবই নয়।

তা ছাড়া নদীর একটা আলাদা ছন্দ আছে। বহুদিন পূর্বে একবার যখন সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচে চড়ে নদীপথে যাত্রা করেছিলুম তখন এই কথাটা সর্বপ্রথম খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলুম। যাত্রার পূর্ব রাত্রে স্টীমার খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি বাঁধা ছিল। সেই সময় বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলুম, কলকাতার মধ্যেই এই নদীতে এমন একটা জীবনযাত্রা আছে যার সঙ্গে আজন্ম কলকাতায় থেকেও আমাদের কোনও পরিচয়ই নেই ; নৌকো আসে যায়, ঘাটে নৌকো বাঁধা থাকে, তার মধ্যে মাঝিমাল্লারা কেমন

ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করে, রাঁধে বাড়ে খায়, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে জলতরঙ্গ বাজনা শোনে, জোয়ারে নৌকো ঈষৎ দুলতে থাকে, আবার কখন ভাঁটা শুরু হয়, ঝড়ের রাতে বাতাস ওঠবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাছি টেনে বাঁধতে হয়, আবার যখন নৌকো চলতে থাকে তখন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন কত বাঁকে বাঁকে ঘুরে ঘুরে তাদের চলতে হয়, কেউ হাল ধরে, কেউ দাঁড় টানে, আবার কেউ বা ছোট কোণটিতে বসে রান্নার উদ্যোগ করে, যে হাওয়ায় রান্নার ব্যাঘাত হয় সেই হাওয়া হয়তো তাদের পাল ফুলিয়ে গতিবেগ বাড়ায়, আবার কখনও বা জলে তুফান তুলে প্রলয়কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। কতরকম নৌকো চলে, খড়ের নৌকো, মালের নৌকো, পান্‌সি - কারও ধীর মন্থর গতি, কেউ বা তরতর করে চলেছে। তটভূমির জীবন থেকে এ বিভিন্ন।

ঝিলমে হাউসবোটে থাকলেও এই কথাটা আবার অনুভব করা যায়। এখানে অবশ্য জোয়ার ভাটার খেলা নেই, জল অবিরত চলেছে কলকলস্বরে শ্রীনগর পার হয়ে সুদূর উলার হ্রদের দিকে, তারপর উলারের পদ্মবন পার হয়ে চলে যাবে পঞ্চনদীর দেশে। ভোর বেলায় দেখি, নৌকো নেই, তীরে শান্ত চেনারের মাথায় রোদ ঝিকিমিকি করতে শুরু করেছে, শুধু জলের কলকল গতি। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দু-একটি করে নৌকো বার হয়, দাঁড়ের আঘাতে নদীবক্ষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রথমে দু-চারটি শিকারা খর-বেগে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে থাকে শহরের দিকে শালগম-কপি-পেঁয়াজ-গাজরের পসরা নিয়ে; তারপর আসে ধীরে ধীরে বড় বড় মালের নৌকো শহরের দিক থেকে লগি ঠেলে উজান বয়ে, যত বেলা হয় ততই কারবারী বেপারীদের শিকারা আসতে থাকে, ক্রমে প্রমোদযাত্রীর দল সজ্জিত শিকারায় গা এলিয়ে দিয়ে বেড়াতে বেরোন; ক্বচিৎ বা দু-একটা হাউসবোট যায় নতুন জায়গায় নোঙর ফেলতে ধীরমন্থর গতিতে, কুলিরা লগি ঠেলে, হাউস-বোটবাসীরা অলসনয়নে তাকিয়ে থাকে। নদীর কিনারাতেও কত

রকমের জীবনযাত্রা, কত লোকের আসা-যাওয়া, নৌকোয় বসে বসেই তীরের লোকের সঙ্গে কতরকম কথাবার্তা, কতরকম কার-বার। ক্রমে বেলা গড়িয়ে আসে, শুরু হয় ফেরার পর্ব, প্রমোদ যাত্রীরা ক্লান্তিতে শিকারায় গা এলিয়ে দেন, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়। চেনারের মাথায় নেমে আসে অন্ধকার, শিকারার শব্দ আর শোনা যায় না, তীরে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু একটানা স্রোতের শব্দ, ওপারের হাউসবোট থেকে দু-চারটি আলো জলে প্রতিফলিত হয়ে কাঁপতে থাকে, মাথার উপরে তারাভরা আকাশ, দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের সারি, শঙ্কর পাহাড়ের মন্দিরচূড়ায় আলো স্থিরজ্যোতিতে জ্বলে ; দু-চারটি রাতচরা পাখীর আওয়াজ, ক্বচিৎ কখনও বহুদূর থেকে কাশ্মীরী মেয়েদের সরল অনাড়ম্বর সুরের সমবেত-সংগীতের এক আধ কলি ভেসে আসে ; সমস্ত মিলিয়ে একটি অনাহত সুর চার পাশে বাজতে থাকে। পৃথিবীর সুর, নদীর সুর আর মহাকাশের সুর এক অখণ্ড সুরে মিশে যায়। এই সম ... ্ই—

The poet ... er dead

কর্ম, কলহ, কোলাহলে ... থাকলে সে সুরটি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু য ... চার মধ্যে সেই বেসুরের বেড়াজাল থেকে মন ... া পৃথিবীর সেই সংগীত আকাশের তারায় ন ... মর্মরে মানুষের মনে অনাহত ঝংকারে বাজ ... oetry of earth is never dead.

॥ পাঁচ ॥

একদিন শ্রীনগর থেকে মোটরে উলার লেক দেখতে যাওয়া গেল। নদীপথেও যাওয়া যায়, কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ; হাউসবোটে উলার পৌঁছতেই তিন দিন লাগে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতেই দেখা গেল দুপাশে খোলা মাঠ, দিগন্তবিস্তৃত ধান ক্ষেত, মধ্যে মধ্যে পপলার গাছ আছে; চাষীদের পোষাকটাও স্বতন্ত্র; কিন্তু এ দুটি বাদ দিলে বাংলা দেশের সঙ্গে একটুও তফাৎ নেই; সেই অবারিত মাঠ, কাদার মধ্যে ধান (এদেশের ভাষায় শালি, অবশ্য অন্য ধানও কিছু আছে) পোতা হচ্ছে, সেই গরু-লাঙলের চাষ। অবশ্য আরও একটা তফাৎ আছে, সেটা হল জলের খেলা। কাশ্মীরের সর্বত্র নহ্‌র আর চশমার ছড়াছড়ি, সর্বত্র কল কল করে চলেছে জলের নালা, ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে তাকে এখানে-ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ক্ষেতে ক্ষেতে চলেছে জলধারা। বাংলা দেশের পাহাড়ে খাড়াই বড় বেশি, ঝরনা লাফিয়ে পড়ে সগর্জনে পাগলাঝোরার মত, কিন্তু কুলু্‌ কুলু্‌ শব্দে বয়ে চলে না মাইলের পর মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে; তাছাড়া আরও তফাৎ আছে। বাঁধাকপির ক্ষেতে লতানো গোলাপের বেড়া— এ-দৃশ্য কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোথাও দেখা সম্ভব কি না জানি নে।

কিছু দূর গিয়ে নজরে পড়ল আঞ্চার লেক। বেশী বড় নয়, জলও ঘোলাটে, শুনলাম পাখী শিকারের আড্ডা। আরও কিছু দূরে গন্ধর্বলে পৌঁছন গেল। অতি চমৎকার জায়গা, সিন্ধু নালা বলে একটি ছোট পাহাড়ে নদী এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কাঁচ কাঁচ রঙের বরফ-গলা জল, দশ বারো মাইল দূরে সাদিপুর নামে একটি

জায়গায় ঝিলমের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। চার পাশে সবুজ মাঠের উপর চেনার গাছের ঘন সন্নিবেশ, তার তলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে নানা চশমা, মিলিত হচ্ছে সিন্ধু নালায়, প্রকৃতির রম্য নিকেতন। শহুরে হৈ-চৈ ভালবাসেন না এমন দু-চারজন প্রমোদযাত্রী এইখানে হাউসবোট নিয়ে এসে থাকেন।

গন্ধর্বল থেকে মাইল দুই দূরে ক্ষীরভবানীর মন্দির। শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, কাশ্মীরে একটি পীঠস্থান আছে। কিন্তু সে পীঠস্থানটি ঠিক কোথায়, তার কোনও হদিস শাস্ত্রে নেই। কেউ বলেন অমরনাথ হল সেই পীঠস্থান, কেউ বলেন, সে পীঠস্থান হল ক্ষীরভবানী। আরও প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র নাকি এখানে পুজো করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর ভ্রমণের সময় এখানে এসেছিলেন, একথা নিবেদিতার বইয়ে উল্লেখ আছে। চার পাশ দিয়ে ছোট একটি জলের নালা ঘুরে চলেছে, মধ্যে একটি দ্বীপের মত ; সেই দ্বীপে চেনার গাছের সুনিবিড় ছায়ায় এই মন্দির একটি দুধবরণ কুণ্ড, তার মধ্যে অতি ছোট একটি মার্বেলের মন্দির, মন্দিরে দেবীমূর্তি, অনেকটা শিলাখণ্ডে সিঁদুর মাখানোর মত, মাথায় রুপোর মুকুট, কর্পূর জ্বেলে সিঁদুর দিয়ে পুজো হয় ; চণ্ডী থেকে পাঠ ও প্রার্থনা করান পূজকেরা, যদিও শুনলাম, দেবী বৈষ্ণবী এবং বৈষ্ণব পদ্ধতিতে পূজা হয়। বলিদান নেই। পুজোর শেষে স্থানীয় বালক-বালিকাদের খাওয়াবার অনুরোধ আসে, পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যাপক ভোজনের উপকরণ লুচি ও হালুয়া তৈরি করাই থাকে।

গন্ধর্বল থেকে একটি রাস্তা সোজা মানসবল হ্রদের দিকে গিয়েছে ; হিমালয় পার হয়ে মানস সরোবরে যাওয়া সহজ নয়, সেইজন্য এইটি নাকি তার অনুকল্প ; কিন্তু এ-লেকটি অত্যন্তই ছোট ; লম্বায় মাইলখানেক, চওড়ায় আধ মাইলের বেশি নয়, কাছে কোনও তীর্থক্ষেত্র রচনার কোনও প্রয়াসের চিহ্নই নেই। কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে। এ অঞ্চলে নদীর জল বা হ্রদের জল অধিকাংশই ঘোলাটে ; কেবল ডাল লেকের জল খুব গভীর রঙের,

প্রায় কালোই। মানসবল হ্রদের জল কিন্তু ঘন গাঢ় নীল— এমন নীল প্রায় দেখা যায় না। আকাশ থেকে লক্ষ্য করেছিলুম ইটালীর চারপাশের ভূমধ্যসাগরের অদ্ভুত নীল রঙ, সত্যিই ওরকম নীল রঙ দেখা যায় না—কিন্তু সেটি ছেড়ে দিলে এমন নীল রঙ আমার চোখে পড়েনি। চারপাশে পাহাড় ঘিরে রয়েছে, মধ্যে সুনীল হ্রদ, কোন বসতি বা কোলাহল নেই, কেবল দু-একটি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে, পাহাড়ের বুকে খচিত একটি নীল পাথরের মত এর সৌন্দর্য অনবদ্য। এই নির্জন হ্রদে জলকেলির জন্য সখীপরিবৃতা হয়ে আসতেন শাহজাহানের কন্যা রোশেনারা। তিনি এখানে একটি ঝরোখা করিয়েছিলেন, আজও তার ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু আছে।

মানসবল হ্রদ ছেড়ে অনেকক্ষণ চলবার পর আমরা উলার হ্রদে পৌছলাম; মিষ্ট জলের হ্রদগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের এইটিই বৃহত্তম। চারপাশে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে লেকটি দিগন্তবিস্তৃত। বাঁদিপুরের কিছু আগে ঝিলম এই হ্রদে প্রবেশ করেছে; উল্টো দিকে সোপুরের কাছে বেরিয়ে বারামূলা উরির দিকে বয়ে চলেছে; উলার লেক এত বড় যে, বেশির ভাগ জায়গাতেই এপার-ওপার দেখা যায় না, জল খুব টলটলে নয়, পরিষ্কারও নয়। পদ্মবন আছে। পাহাড়ের ধার ধার দিয়ে মোটরের রাস্তা; লেকের পশ্চিম তীরে একটি ছোট পাহাড়ের মত আছে, নাম বাবা শুকুর-দিন; তার চূড়া থেকে উলার লেকের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়; এই পাহাড়ের তলায় হল ওয়াটলব বাংলো—সেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম করেন, খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, খাবার সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। ওয়াটলবের কিছু দূরে সোপুর—এখানে ঝিলম নদী উলার লেক পরিত্যাগ করে বারামূলার দিকে চলেছে। সোপুরের কিছু দূরে সংগ্রামা, সেখানে পুরানো রাওয়ালপিণ্ডি-শ্রীনগর রাস্তা পাওয়া গেল। কাশ্মীর আক্রমণের সময় হানাদারেরা এই পথ ধরে এগোতে এগোতে শ্রীনগরের কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত

অগ্রসর হয়েছিল। সেইখানে একটা ক্যানালের ব্রিজের কাছে ভারতীয় সেনার সঙ্গে প্রথম লড়াই হয়। শোনা গেল, স্থলযুদ্ধটা হয়েছিল বন্দুক, মেশিনগান, হাতবোমার সাহায্যে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমাবর্ষণ কবা হয় হানাদারদের উপরে। আক্রমণ শুরু হবার পনের মিনিটের মধ্যেই নাকি 'কাবাইল' (অর্থাৎ কাবুলী) হানাদাবেরা সবেগে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন। সাধারণ লোকে গল্প বলে, নোউরু (নেহরু) সাহেব হুকুম দেওয়ামাত্র চিড়িয়াকি তবেহ্ হাওয়াই জাহাজ আসতে লাগল আর চিঁউটিকে (পিঁপড়ে) মাফিক হিন্দুস্থানকে ছোলদারী (Soldiery) চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাবায়েল ডাকাবাজের দল করল পৃষ্ঠপ্রদর্শন। যতক্ষণ হিন্দুস্থানকে ছোলদারী আসেনি, ততক্ষণ সাধাবণ কাশ্মীরীরা ঘরের ছাদ থেকে চুপি চুপি দেখছিল গুলমার্গ পর্যন্ত আগুন জ্বলছে, গুলি চলছে। কাশ্মীরীরা পাহাড়ে জাত হলে কি হয়, বোধ হয় আমাদেরই মত ভাত খায় বলে খুব নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির, কাবায়েল ডাকাবাজদের সম্বন্ধে এদের স্মৃতি এখনও ভীতিবিহ্বল।

আমরা আর একদিন পহলগ্রামের দিকে বেড়াতে গেলুম। উলার লেকের দিকে গেলে যে ধবণের দৃশ্য নজরে পড়ে, পহলগ্রামের দিকে দৃশ্য ঠিক সেরকমটি নয়; প্রথমত, বহুদূর পর্যন্ত ঝিলম নদীর পাশে পাশে বাস্তা, পাহাড় বা সমতল ভূমির বাঁকে বাঁকে ঝিলম বয়ে চলেছে। এখানে সে শহরের মালিন্য থেকে মুক্তি পেয়েছে, জল আবর্জনামুক্ত ও মালিন্যহীন, খরস্রোতে বাঁকে বাঁকে সে বয়ে চলেছে। অপূর্ব তার শোভা। ঝিলমের আর একটি বিশেষত্ব হল তার জলের ফেনা, খরস্রোতে জল ধাক্কা পাবার জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সমুদ্র ফেনের মত থোকা থোকা ফেনা জলে ভেসে চলেছে। ঢেউ নেই, তবুও ফেনা। "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে—"একথা কবি হয় তো ঝিলমকে উদ্দেশ করে লেখেন নি, কিন্তু একথা ঝিলমের

পক্ষে যত সত্য, বোধ হয় অন্য কোন নদীর পক্ষেই তত সত্য নয়। তাছাড়া আরও একটু দূরে গিয়ে পড়লে ঝিলমের সীমানা পার হয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয় লিডর উপত্যকায়। কোলাহোই গ্লেশিয়ার, অমরনাথ ও অন্যান্য পাহাড়ের বরফ-গলা জল বহন করছে এই গিরিনদী, পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাথরের উপর দিয়ে তীব্র স্রোতে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে। সিকিমের পথে তিস্তার মত তার দুপাশে খাড়া পাহাড় নয়—এখানে কেবল একদিকে পাহাড়। তার পাশে নদী, তারপর বিস্তীর্ণ শ্যামল শালি ক্ষেত। এর বিস্তারও তিস্তার চেয়ে কম, কিন্তু সাদৃশ্য হল ঐ খরবেগ। লিডরের বেগ বোধ হয় তীব্রতর। তাছাড়া তিস্তা উপত্যকার চারপাশের রঙ হল খুব ঘন গাঢ় সবুজ, প্রায় কালো। তার উপর দুপাশে ভয়ংকর খাড়া পাহাড়—পড়লে রক্ষা নেই। কেমন একটা ভয়ংকরতার ছায়া চারপাশে। এখানকার রঙ হল কচি সবুজ—ধানের রঙ, বসন্ত কালের পাতার রঙ। তার উপর চাষ হচ্ছে, ঘোড়া চরছে, মানুষে অ-ভীত অবস্থায় চলাফেরা করছে—এর একটা কোমল প্রসন্ন শ্রী আছে, যা তিস্তায় নেই।

এই পথে শ্রীনগর থেকে আট মাইল দূরে পামপুর। এই পামপুরই হল জাফরান চাষের একমাত্র কেন্দ্র। প্রবাদ আছে, এখানকার জিয়ারতে কে কবে প্রার্থনা করেছিলেন, সেজন্য নাকি এইখানেই জাফরান (ওদেশের ভাষায় কেশর) হয় ; অন্য কোথায়ও হয় না। পথের ধারেই সেই মসজিদ, ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল যাত্রীই মসজিদের সামনে রাখা পাত্রে কিছু প্রণামী দিয়ে যায়। কার্তিক মাসে জাফরান ফুল ফোটে, তার লালচে সোনালি আভায় সারা মাঠ যায় ছেয়ে, গন্ধে চারপাশ মৌ মৌ করতে থাকে। সেই শোভা যখন কার্তিকী পূর্ণিমার দিন পরিপূর্ণতায় পৌঁছয় সেই সময় আকাশ থেকে উপচেপড়া সোনালি চাঁদের আলোর তলায় সেই অপরূপ সোনালি জাফরান ক্ষেতে মাঝরাতে এক মেলা বসে। চাষীরা স্ত্রী-পুরুষে আনন্দে গান গায় ; সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখে। দূর হতেও

নানা লোক জড়ো হয়। জুন মাসে সে ঐশ্বর্য-সমারোহের কিছুই নেই, এখন গাছগুলি শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে পড়ে আছে।

পামপুরের কিছু পরে, রাস্তা হতে কিছু দূরে, জীওন বলে একটা জায়গা আছে পাহাড়ের উপর। সেখানে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ও অন্য নানা রকমের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে—পণ্ডিত লোকেরা দেখতে যান। আমাদের মত অ-পণ্ডিত লোকের কিন্তু আরও উৎসাহ হল ঐখানে রাস্তার পাশে মাটির উপর বসানো একটি হাউসবোট দেখে। ডানদিকে বেশ খানিকটা নীচে বয়ে চলেছে ঝিলম, আর রাস্তার বাঁদিকে অনেকখানি দূরে খটখটে উঁচু জমির উপর একটা হাউস বোটে লোক বাস করছে—ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার শুনে তো আশ্চর্য! একবার ঝিলমে এসেছিল প্রবল বন্যা; জল বাড়তে বাড়তে খাদ ছাপিয়ে, রাস্তা ছাপিয়ে, ওপারের মাঠের উপর দিয়ে স্রোত সগর্জনে বয়ে চলল, ভাসিয়ে নিয়ে এলো হাউস বোটটিকে নদী থেকে অতদূরে। একটি গাছের ধাক্কা খেয়ে হাউস বোটটি থামল, সেখানেই তাকে হল বাঁধা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে জল দ্রুত নেমে গেল, অতএব হাউস বোটটি সেই গাছের তলায় খটখটে ডাঙা জমির উপর এ পর্যন্ত বিরাজ করছে।

আরও কিছু দূরে অবন্তীপুর। পথের ধারে দুটি ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। কাশ্মীরে অবন্তীবর্মা রাজত্ব করেছিলেন বোধ হয় ৮৫৮ থেকে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির; আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। স্থানীয় প্রবাদ-বাক্য হল এ মন্দির পাণ্ডবদের তৈরি। পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে প্রাচীন কীর্তিগুলিকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা এখানে খুব বেশি। শ্রীনগরের কাছে পাণ্ড্রেমান মন্দির আছে। পাণ্ড্রেমান, হরিপর্বত, অবন্তীপুর—সর্বত্রই পাণ্ডবদের টেনে আনবার চেষ্টা যদিচ দু-চার জায়গায় অন্তত ইতিহাস বা পুরাণ অন্য কথা বলে। এই পথে আর একটু দূর এগোলে খান্নাবল এবং অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদ পড়ে। অনন্তনাগ থেকে ডানদিকে রাস্তা বেঁকেছে, আচ্ছাবল-কোকরনাগ-ভেরিনাগের

দিকে। এই দিকেই ঝিলমের বা বেথ্ (বিতস্তা) নদীর উদ্ভব। আর খান্নাবল থেকে ডাইনে জম্মুর পথ বেঁকেছে—বানিহল পার হয়ে প্রায় দু'শ' মাইল দূরে জম্মু। খান্নাবল আর অনন্তনাগ কাছাকাছি। অনন্তনাগে পৌঁছে আমরা সিধে পহলগ্রাম যাবার বদলে ডাইনে বেঁকে দশ মাইল দূরে আচ্ছাবল দেখতে গেলাম। ছোট একটি গ্রাম, যথানিয়মে অত্যন্ত নোংরা, কিন্তু তারই মধ্যে পাহাড়ের তলায় জাহাঙ্গীর একটি বাগান তৈরি করেছিলেন। বাগানটি খুবই ছোট, শালিমার বা নিশাতবাগের মত কারুকার্য কিছুই নেই; জলটুঙ্গীগুলো ভাঙা ভাঙা, তাতে শালিমারের জলটুঙ্গীর মত পাথরের কাজ বা মিনেকরা টালির কাজ কিছুই নেই। তবু সৌন্দর্যে এটি অতুলনীয়। পাহাড় থেকে একটি ঝরণা নেমে আসছে; তাকে তিন ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রধান ধারাটিকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে, এখানেও পর পর থাক কাটা, সেই থাকের উপর হতে জল পড়ছে কুলু কুলু ঝরণার মত; তলায় ফোয়ারার খেলা, চারপাশে দীর্ঘ সুবৃহৎ চেনার গাছ, তার তলায় বাঁধানো বেদী, চারপাশে সুনিবিড় শান্তি। সেই ছায়াঘন বেদীতে ইরানী কার্পেট বিছিয়ে আমাদের প্রাতরাশ সম্পূর্ণ হল। এই বাগানের এক কোণে ছিল নূরজাহানের হামাম—এখন তা ভগ্নস্তূপে পরিণত। তবুও গরম জল ঠাণ্ডা জল চলবার ব্যবস্থার নিদর্শন সেই ভগ্নস্তূপে কিছু কিছু আছে। এই বাগানের ঠিক পিছনেই একটা বেশ বড় ট্রাউট-পরিবর্ধন কেন্দ্র। রক্ষকেরা খুব আগ্রহ করে দর্শকদের দেখায়, কিন্তু শেষকালে দক্ষিণা চায় খুব বেশী। শোনা গেল, এই বাগানটির উন্নতির জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার পৌনে দু লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

আচ্ছাবল থেকেই আমরা ফিরলাম; কারণ ওখান থেকে কোকরনাগ-ভেরিনাগের দূরত্বও কম নয়; আর শোনা গেল, কোকরনাগে একটি ঝরণা ছাড়া নাকি আর কিছু নেই। বিশেষত্ব হল, কোকর, অর্থাৎ মুরগীর পায়ের মত পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য

ছিদ্র, সেই ছিদ্রপথে ঝরণা বেরিয়ে আসছে। ভেরিনাগে একটি নদী আছে; সেটা হল ট্রাউট-শিকারীদের আড্ডা। তাছাড়া নাকি আছে একটি বৃহৎ জলাধার, চন্দ্রভাগার উৎপত্তিস্থল। সেদিকে অগ্রসর না হয়ে অনন্তনাগে ফিরলাম। অনন্তনাগে গরম জল ও ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড আছে। গরম জলের কুণ্ডটি ছোট, গন্ধকের গন্ধে পরিপূর্ণ; ঠাণ্ডা জলের কুণ্ডটি বড়, তার মধ্য দিয়ে হুড় হুড় করে একটি ঝরণা বয়ে চলেছে। দুটিই অত্যন্ত অপরিষ্কার।

অনন্তনাগ থেকে আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে চললাম পহলগ্রামের দিকে। যাবার পথে আর কোথায়ও থামা নয়। কিন্তু পাহাড়ের রাজত্ব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গতি হয়ে এলো মন্থর। ডানপাশে উঠে গেছে পাহাড়, তার গা কেটে চলেছে রাস্তা। রাস্তার পাশে চলেছে নদী, খরবেগে পাথরের উপর লাফাতে লাফাতে। নদী থেকে নালা কাটা হয়েছে নানা জায়গায়, কোথাও-বা ছোট বাঁধ দিয়ে জলের লেভেল উঁচু করে নালা টানা হয়েছে উপর দিকে, রাস্তার পাশ দিয়ে রোদে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে চলেছে নালার জল—রাস্তার এপাশে নালা, ওপাশে নদী। নদীর অপর পার থেকে দিগন্ত পর্যন্ত চাষের জমি, কাঁচা সবুজ ধান বাতাসে হিল্লোলিত। একটু ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যায়, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে বরফমণ্ডিত গিরিচূড়া একটু আধটু উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করে। অপূর্ব দৃশ্য। চিরবসন্তের আভাস মেলে।

পহলগ্রামে পৌঁছতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। পাহাড়, বন, নদীর পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ চলেছে। অবশেষে পৌঁছলাম পহলগ্রামে। প্রথমেই পড়ল বাজার। ছোট পল্লী, মধ্যেখান দিয়ে রাস্তা, দুপাশে কিছু বাড়ি, পোস্টাফিস আছে, বাজারে জিনিস-পত্র মন্দ পাওয়া যায় না। ঘোড়া অনেক। তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। অমরনাথের যাত্রীরা এইখান থেকে ঘোড়ায় বা পদব্রজে যাত্রা করেন, কোলাহোই তুষারনদীর দর্শকেরাও। পার্বত্য ভ্রমণে যাঁরা খুব মজবুত তাঁরা অমরনাথের কাছাকাছি গিয়ে কোলাহোই তুষার

নদীর মাথা টপকে চলে যান পশ্চিমে সোনামার্গের দিকে, সোনামার্গ গন্ধর্বল হয়ে নেমে আসেন। এ-পথ সাধারণের জন্য নয়, খুব মজবুত পর্বতচারীদের জন্য। বরফের মধ্য দিয়েই অধিকাংশ পথ নাকি।

আমরা বাজার পার হয়ে পথ যেখানে লিডর নদীর কাঠের পুলের কাছে শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে এসে থামলাম। প্রথম দর্শনে কাশ্মীরের প্রতি যে অভক্তি হয়েছিল উলার দেখেও তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়নি। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াতেই সকল অভক্তি ক্ষোভ সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে গিয়ে মনটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। সামনে বরফমণ্ডিত চূড়া দেখা যেতে লাগল, অমরনাথ না দেখলেও পাহাড়ের তুষারচূড়ায় দেখতে পেলাম মহাদেবের রজতগিরিনিভ প্রত্যক্ষ রূপ। আশেপাশে পাহাড়ের মাথাতেও ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে অল্পস্বল্প তুষাররেখা, নেমে এসেছে চূড়া থেকে পাইন বনের তলায় তলায় সেই রেখার ধারা, মিষ্টি ঠাণ্ডার আমেজ, ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে ভীমগর্জনে নদী, পাথরে পাথরে জল ছিটকে লাফিয়ে উঠছে, ভেঙে পড়ছে সফেন ধারায়, চারপাশে পাইনের সুবিন্যস্ত সারি। ইতস্তত তাঁবু খাটিয়ে দর্শকেরা বাস করছেন। সামনেই পড়ে আছে মহাতীর্থ অমরনাথের পথ। পথ খোলা থাকলে তিনদিনে পৌঁছন যায়। চোদ্দ হাজার ফুটে পাহাড়ের গায়ে বিরাট গুহা। গুহার ছাদ হতে টপ টপ করে জল ঝরে নাকি শিবলিঙ্গের উপর। গুহার মেঝেতে বরফে নাকি বিরাট শিবলিঙ্গ আপনা আপনি গড়ে—সেই সঙ্গে পার্বতী ও গণপতি মূর্তিও। পথে কষ্ট আছে, তুষার-ঝড় আছে, তবু প্রতি বছর অগণিত যাত্রী আসেন শ্রাবণ-পূর্ণিমার দিন দর্শন করতে। সে সময় সরকারী ব্যবস্থা হয় পথ পরিষ্কারের, ডাক্তার-খানার। ঐদিন নাকি কয়েকটি পায়রা দেখা যায়; তীর্থযাত্রা সফল হয় না, যাঁরা পায়রা দেখতে পান না। শিবলিঙ্গের নাকি তিথি অনুসারে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, শ্রাবণ পূর্ণিমায় তাঁর পূর্ণতম আকার। শ্রীযুত নির্মলকুমার বসুর মুখে শুনেছি, নভেম্বর মাসে গিয়ে তাঁরা কোনও

মূর্তিরই দর্শন পাননি। জনশ্রুতি, অমাবস্যার দিন নাকি কোনও মূর্তিই থাকে না, আবার পূর্ণিমায় তাঁদের পরিপূর্ণতা। এই মহা-তীর্থের উদ্দেশে প্রণাম জানালুম। শোনা গেল অমরনাথের কাছেই শেষনাগ হ্রদ। আমরা থাকতে থাকতে এক পাঞ্জাবী দল গিয়েছেলেন বরফ ভেঙে, তাঁদের মুখে শুনলাম এখনও বরফ যথেষ্ট। কিন্তু শেষনাগে পৌছতেই তাঁরা দেখলেন, অর্ধেক তুষার গলেছে; চারদিকে পাহাড়, বরফের মধ্যে খানিকটা জল দেখা যাচ্ছে, গভীব স্বচ্ছ নীল, তার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে তুষারের পিণ্ড। অপরূপ দৃশ্য। তখনও বরফ গলেনি, তাই অমরনাথ যাত্রা আমাদের হল না; কিন্তু মনে হল কোথায় শ্রীনগর আর কোথায় অমরনাথ বা শেষনাগ হ্রদ বা কোলাহোই তুষার নদী। কলকাতা দেখে ববং বাঙলাদেশ চেনা যায়; কিন্তু শ্রীনগব দেখে কাশ্মীর কদাপি নয়।

পহলগ্রামে থাকবার জায়গা বেশি নেই। তিনটি মাত্র হোটেল আছে, প্লাজা, ওয়াজির এবং খালসা হোটেল। গাইডবুকে এদেব খরচপত্র একরকম লেখা থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবেব সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল হল প্লাজা হোটেল, কিন্তু তাব চেহারা দেখে মনে হল নেড়ু হোটেলও এর তুলনায় স্বর্গ। আহার্য এবং বাসনপত্র ময়লা এবং অপবিষ্কার; আমরা একফ্লাস্ক দুধ-চিনিবিহীন শুধু চা নিয়েছিলাম এখানে, তাবই মূল্য দিতে হল সাড়ে সাত টাকা; কৈফিয়ৎ—আজকাল প্লেনে সব জিনিস আনতে হয় শ্রীনগর পর্যন্ত, তারপর এতদূর মোটরে। মোটরের তেলও তো আনতে হয় ঐ প্রকারে। অগত্যা চুপ কবে যেতে হল। এইসব হাঙ্গামা থেকে বেঁচে অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বাসা করতে গেলে পহলগ্রামে তাঁবুতে থাকা উচিত। আসবাব বাসনপত্র-সমেত তাঁবু পহলগ্রামেই ভাড়া পাওয়া যায়, শ্রীনগর থেকেও ব্যবস্থা করতে পাবা যায়। ইলেক্‌ট্রিকের অভাব নেই; তাঁবু খাটাবার জমিব জন্য সরকারকে দু-এক টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সরকার থেকে বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ ও মেথরের বন্দোবস্ত করে দেওয়া

হয়। আলো জ্বালবার খরচ মিটার দেখে দিতে হয়; মেথরকেও আলাদা কিছু দিতে হয়। নদীর ধারে এরকম বহু তাঁবু পড়েছে, কেউ-বা দূরে পাহাড়ের উপর নির্জনে পাইনবনে তাঁবু খাটিয়েছে, ঝিরঝিরে শীতল মধুর হাওয়া, বেগবতী নদী; চারপাশে পাহাড়,-- এর মধ্যে তাঁবুতে বাস না করলে এই সৌন্দর্য পরিপূর্ণ উপভোগ করা যায় না। শ্রীনগরে হাউসবোটে কিছুদিন বাস আর পহলগ্রামে তাঁবুতে—কাশ্মীরযাত্রীদের পক্ষে এ দুটি অবশ্য কর্তব্য।

অবশেষে পহলগ্রাম ছেড়ে ফিরবার পথে রওনা হতে হল। পথে দুটি জিনিস দেখা গেল। বুমজো নামে একটি জায়গায় রাস্তা থেকে কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে দুটি গুহা, একটি গুহার ভিতর একটি শিবলিঙ্গের মত আছে। অপর গুহাটি বন্ধ। সেটির নাকি শেষ নেই। অনেক লোক নাকি তার শেষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আর ফেরেনি; সেজন্য সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরই কিছু দূরে মার্তণ্ড বা মাটন বা বওয়ন। এখানে সূর্যের জন্মভূমি বলে লোক-প্রসিদ্ধি। বামাদিত্য এবং পরে ললিতাদিত্য প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে মন্দিরটি গড়েছিলেন সেটি রাস্তা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে পাহাড়ের উপর। আজ তার সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নেই; তবু তার পাথরে খোদাই কারুকাজ আর Trifoil Arch-গুলি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পথের পাশেই বর্তমান মার্তণ্ড মন্দির। দরজার কাছে পৌছতেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাণ্ডারা ঘিরে ধরল। "আপনার নামটা কি? না হলে অন্ততঃ পদবীটা বলুন। ঘোষ, বোস, বাঁড়ুয্যে, লাহিড়ী? আমি শোভাবাজার চিনি, স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ী আমার যজমান। নামটা তো বলে ফেলতেই হয়, তা নাহলে পুণ্য হবে না।" আমরা যত বলি আমাদের পুণ্যে প্রয়োজন নেই, আমাদের কোনও নাম নেই, আমাদের বাড়ী ভারত-বর্ষ, আমরা জাতে মানুষ, ততই তাদের চ্যাঁচামেচি বাড়তে থাকে। বহু তীর্থ দেখেছি, গয়া পুরী কাশী এলাহাবাদ দেওঘর ঘুরেছি, কিন্তু এরা এ সবার বাড়া। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যে হলে বলতেন,

তাঁকে ভূতে ধরেছে বাঘে তাড়া করেছে, কিন্তু এমন বিপদে তিনি কখনই পড়েন নি। একজন রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের সই দেখালেন তার খাতা খুলে, সইটা ঠিক বলেই মনে হল, যদিচ সন্দেহ একেবারে গেল না। অনেক কষ্টে তাদের হাত হতে মুক্তি লাভ করে মন্দিরটি দেখা গেল। মন্দিরের সামনেই একটি সুন্দর স্বচ্ছ জলভরা কুণ্ড, কুণ্ডে হাজার হাজার ছুরী মাছ পালন করা হচ্ছে, এক টুকরো রুটি ফেলে দিলে তারা সকলে তীরবেগে ছোটে। কুণ্ডের উপর বর্তমান মার্তণ্ড্য মন্দির। মন্দিরটি ছোট, তার মধ্যে শ্বেত পাথরের সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে সূর্যমূর্তি। সূর্যমূর্তিটির front view, কিন্তু রথ ও অশ্ব profile, জয়পুরী কাজ যেমন হয়, সেইরকম মোটা মোটা খোদাই, কোনও সূক্ষ্ম কারুকাজ নেই। পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করলুম, এ মূর্তি কতদিনের এবং এই মূর্তিই আগে ললিতাদিত্যের মন্দিরে ছিল কিনা? উত্তরে কোনও জনশ্রুতিরও খবর পাওয়া গেল না, কেবল শুনলাম এই মূর্তি অনন্তকালের।

ফিরবার পথে আবার অনন্তনাগ খান্নাবল অবন্তীপুব পেবিয়ে বিজবাহার বলে একটা ছোট পল্লীতে থামলুম। এখানে পথের ধারে একটি চেনার বাগান আছে, তার মধ্যে তলায় বেদীবাঁধান একটি সুবৃহৎ চেনার গাছ আছে, কাশ্মীরের নাকি সেইটিই সবচেয়ে বড় চেনাব গাছ। আমরা তার তলায় বসে চা-পান করছি, বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় উঠল প্রচণ্ড ঝড়, ধূলোর আঁধি এবং একটু পরে ধারাবর্ষণ। ঝড় বর্ষণ কাশ্মীরে বেশি নেই, এই প্রথম পরিচয়। তার মধ্যেই কোন রকমে শ্রীনগরে হাউসবোটে এসে পৌঁছেছি, ঝড় তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল, ঝিলমের জলস্রোত প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়তে লাগল বোটের গায়ে, অতবড় বোট বেশ দুলছে, হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক তার গেল ছিঁড়ে, চারপাশে নিবিড় অন্ধকার, বোট আরও দুলছে, বেশ দুলছে, সহসা সেই ঝড়জলের মধ্যে বোটের মাঝিরা টর্চ হাতে লাফিয়ে পড়ল তীরে, একটা শিকলের খুঁটি গেছে উপড়ে, বাঁধো আবার জোর করে শিকল, তবু

ঝিলমের গর্জন বাড়ছে, ঝড় বাড়ছে, আবার বোট দুলছে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে আমরা কলকল শব্দ শুনছি, অনুভব করছি ঝিলমের আজ এ কী রূপ !

দুলছে তরী নদীর স্রোতে তরঙ্গবন্ধুর !

অথচ পরদিন সকালে মেঘ কেটে গেল, বর্ষাস্নাত আকাশ গভীর নীলে পরিব্যাপ্ত, মিঠে সোনালি রোদ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে, পাহাড়ের চেহারা আরও নীল, বরফ ঝক্‌ঝক্ করছে, নদীর জল বেড়েছে, পরিষ্কার টলটলে স্রোত খরতর বেগে চলেছে, ডাল লেক কূলে কূলে ভরা, হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ভাসমান বাগানগুলিতে চাষীরা কর্মব্যস্ত, শাদা শাদা পর্দা উড়িয়ে চলেছে অজস্র শিকারা পাখনা-খোলা উড়ন্ত বকের মত। পূর্বরাতের দুর্যোগ সাময়িক দুঃস্বপ্নের মতই লয় পেয়ে গেছে। অকস্মাৎ দুর্যোগের পর একটি পরিপূর্ণ দিন।

॥ ছয় ॥

মানুষের দেখা সবসময় ড্রইংরুমে পাওয়া যায় না। চালে চলনে নিখুঁত কেতা-দুরস্ত লোকের সন্ধান হয়তো সেখানে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় কখন এই দমবন্ধ-করা আবহাওয়া হতে মুক্তি পাব। অথচ, পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক এক সময় অত্যন্ত সাধারণ স্তরেও এক একজন মানুষের দেখা মিলে যায়, যাদের পরিচয় পেলে মন আশ্বস্ত হয়, পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে প্রাণ ভরে যায়। হয়তো তাদের শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই, চাল নেই চলন নেই, বেশভূষা নেই আড়ম্বর নেই, পুঁথিগত বিদ্যার ভার নেই, সামাজিক পালিশের চটক নেই —কিন্তু তবু তারা এমন পরিপূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে জীবনটিকে বহন করছে, মানুষকে ভালবাসতে জানে, লোভ ক্রোধে তারা দিগ্ধ নয়, স্বল্পে সন্তুষ্ট, আনন্দে ভরপুর। শ্রীনগরে হঠাৎ এমনই একজন লোকের সন্ধান মিলে গেল। তার নাম সাদিক চেলা। সে হল ফুলওয়ালা, ছোট্ট একটি বোট নিয়ে ঝিলমের হাউসবোটে হাউসবোটে ফুল বিক্রি করে বেড়ায়। বয়স কত তার ঠিক নেই, অনেকেই বলে সে নব্বই পেরিয়েছে, গলিতদন্ত, ঝাঁকড়া চুল আর দাড়ি, শতচ্ছিন্ন জামা, মুখে একটি প্রশান্ত হাসি। প্রথম দিনই সে প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে এসে বলল—ফুল নাও। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, সাধারণ ব্যবসাদারের দীনতা নেই। যেন জানে, তার কাছে ফুল আমি নেবই। দ্বিধাও তার সেইজন্য নেই। ঐ ফুলদানিটায় হলদে ফুলগুলি রাখো, মাঝের ফুলদানিটায় এই বড় কমলটি দাও, কোণে এই নীল ফুলগুলি রাখো। এত ফুল দিলো দেখে, শস্তুরে

মানুষ আমরা, শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দাম ? উত্তর পেলাম, আমার ফুলের কোন দাম নেই, ফকিরের চেলা আমি, পেটটা চলে গেলেই হল, যদি তোমার কাছেই তা পেয়ে যাই তা হলে আর আর ফুলবিক্রি করতে যাব না, বাকী ফুলগুলি বাবা ধরমদাসের মন্দিরে সাজিয়ে দেব। ফকিরের মানা আছে ভিক্ষে করতে, তাই এই ফুল নিয়ে আসি।

এমন আশ্চর্য বেপারীর হাতে কখনও পড়িনি। আমি তাকে একটি টাকা দিলাম। বুড়ো খুব খুশী হয়ে বলল, আমার এত প্রয়োজন ছিল না, যাই হোক্ এতে আমার ক'দিন বেশ চলে যাবে, ক'দিন আর ফুল বিক্রি করতে হবে না, আমার ফকিরের কবরেই ক'দিন সব ফুল দিতে পারব। এই বলে বুড়ো বোটের মুখ ফিরিয়ে উজান বয়ে শহরের বাইরে চলে গেল, আর ফুল বিক্রিও করল না। তারপর তিন চারদিন আমরা ঝিলমে যথেষ্ট বেড়ালাম, কিন্তু সাদিক চেলার আর কোনও সন্ধানই নেই। তারপর একদিন সে এসে হাজির। সেদিন দাম দিলাম আট আনা, কিন্তু ফুল দিয়ে গেল প্রথম দিনের চেয়ে অনেক বেশী ; আর দিল একটি প্রকাণ্ড ম্যাগনোলিয়া, গন্ধে তার চারদিক ভরপুর, বলল, তোমারই জন্য এনেছি।

এমন আশ্চর্য মানুষ তো সচরাচর দেখা যায় না। অভাব তার যথেষ্ট, কিন্তু তবু তার অভাববোধ নেই, অভাববোধের পীড়নও নেই। শতচ্ছিন্ন জামার চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন সে বোধ করে না। সব ফুলগুলি ব্যবসাদারের মত বিক্রি করলে সহজেই তার তিন চার টাকা দৈনিক উপার্জন হতে পারত, কিন্তু তাতেও তার দরকার নেই। গুরুর নিষেধ ভিক্ষা করা, তাই ফুল বিক্রি তার জীবিকার উপলক্ষ্য মাত্র ; ন্যূনতম প্রয়োজনটি মিটে গেলেই সে আর ফুল বিক্রি করবে না, সে ফুল সাজিয়ে দেবে পীরের কবরে কিংবা বাবা ধরমদাসের মন্দিরে। পীরের চেলা, কিন্তু মন্দিরে মসজিদে তার কোনও তফাৎ নেই, কোন সংসার নেই, অবিবাহিত সে, তার

আস্তানাও কিছু নেই, আজ এখানে কাল্ ওখানে কাটিয়ে দেয়। তাই সে ফুল বিক্রিও করতে আসে সাধারণ কারবারীদের মত লম্বা সেলাম ঠুকতে ঠুকতে নয়, বেশ সহজে স্বচ্ছন্দে, যেন তার একটা দাবী আছে—সে দাবীপূরণ করবার জন্য আমরা রাজী হয়েই আছি। তার এই জোরের মূল ব্যবসাদারীতে নয়, ব্যবসাদারীতে এ জোর হয় না, তার মূল অন্যত্র।

একালের হালচাল সম্বন্ধেও তার কোন আফশোস ছিল না। সেকালের তুলনায় একালের মতিগতির কথা জিজ্ঞাসা করলে সে হা হা করে হেসে উঠত। বলত অবশ্য যে, যুগ অনেক বদলে গিয়েছে। তা না হলে দেখুন না সরকার, এই ফুল কি বিক্রি করবার জিনিস, না ঘর সাজাবার জিনিস ? এ তো তুলে এনে দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে হয়। সেকালে মহারাজারা সকালে উঠে পূজা সেরে সূর্য প্রণাম করতেন, তারপর তিন চার শিকারা ফুল ভাসিয়ে দিতেন ঝিলমের জলে। তখন মহারাজার বাড়ীতে সন্ন্যাসীদের সদাব্রত খোলা থাকত। তার উপর অমরনাথযাত্রী সাধুরা মহারাজার কাছ থেকে পেতেন পথের খাদ্যদ্রব্য ও প্রত্যেকে একখানি কম্বল। আজ সে সব দিন বদলে গিয়েছে। তখন মানুষে কি নিষ্ঠার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করত কত কষ্ট উপেক্ষা করে। আর আজ হয়তো হাওয়াই জাহাজ গিয়ে নামবে অমরনাথ গুহার সামনে। তক্‌লিফের আসান তো হল সরকার, কিন্তু তাতে কি ইন্‌সাফের দিল্ সাফ হবে ? কিন্তু আফশোসের কি আছে সরকার ? খোদার রাজত্বে আফশোসের কিছু নেই, এ সবই তাঁর পরীক্ষা, এই বলেই আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

আশ্চর্য লোক। এমন করে জীবনকে বহন করা, এই সমাজে থেকেও অক্রোধের মধ্যে অগ্রহের মধ্যে আনন্দলোকে বাস করা, এই তো পরম প্রশান্তি, জীবনের এই তো পূর্ণতা। আমাদের শিক্ষিত সভ্য মানুষের সত্তা কত খণ্ডিত, দ্বেষ-হিংসায় জর্জর, অপ্রাপ্তির আশঙ্কায় ত্রস্ত, জীবনকে আমরা এমনভাবে গ্রহণ করতে

পারি কই ? অথচ এই অশিক্ষিত অমার্জিত বৃদ্ধের মধ্যে জীবনের কি সুন্দর রূপই না মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

তার একটি মাত্র অনুরোধ ছিল, তার একটি ছবি তুলে দিলে সেই ছবিটি তার দেহান্তের পর গুরুর কবরের পদতলে রাখা থাকতে পারবে। তার একটি ছবি তুলে দিয়েছিলাম।

॥ সাত ॥

এখন এদের জীবনযাত্রার কথা দু'চারটে বলি। এদেশে এসে সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে এদেশের নিদারুণ দারিদ্র্য। আমরা দরিদ্র দেশের লোক, দারিদ্র্যদশা দেখতে আমাদের চোখ অত্যন্ত অভ্যস্ত, সাধারণ হীন দশা আমাদের চোখে না ঠেকবারই কথা, কিন্তু সেই চোখেও এদেশের দারিদ্র্য বেশ ঠেকে। শ্রীনগর শহর তো এতকাল ধরে প্রমোদের কেন্দ্র হয়ে আছে, কিন্তু ভারত-বর্ষের অন্যান্য পাহাড়ে শহর যেমন বিদেশী এবং এদেশী ধনবানদের কৃপায় সুসজ্জিত শ্রীনগর তা নয়। তার একটা কারণ বোধ হয় কাশ্মীরে বিদেশীদের জমি কেনা বাড়ী করা সুগম ছিল না, সম্ভবত এখনও কিছু কিছু বাধানিষেধ আছে। কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয়, কাশ্মীরে ধনবান ব্যক্তি থাকলে তাঁদেরও তো দু'চারটি প্রাসাদ থাকতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। প্রাসাদ বলতে ঐ মহারাজার প্রাসাদ ছাড়া আর কিছু নেই। ডাল লেকের ধারে গুটিকয়েক সুশ্রী আধুনিক বাড়ী আছে মাত্র। শ্রীনগরের অধিকাংশ বাড়ী এক বিচিত্র ভঙ্গীর। সাধারণত নিচের তলাটা মোটা মোটা পাথরের মুখে জোড় দেওয়া দেওয়াল, যাকে বিশেষজ্ঞরা বোধ হয় বলে থাকেন সাইক্লোপীয় পদ্ধতি। তার উপরের তলাগুলো সাধারণত ছোট ছোট টুকরো ভাঙা ইটের গাঁথনি—গাঁথনি বললে হয়তো ভুল করা হবে, কেন না কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ঝুরো মাল মশলা বা কাদা ফেলে তার মধ্যে ইটের টুকরোগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। কোনও বাড়ীর বাইরের দেওয়ালগুলিতে পলেস্তারার কোনও

বালাই নেই, জানালাগুলিতে বেশির ভাগ কাঠের জালি-কাজ করা, মাথার উপর সমান পাকা ছাদ নেই বললেই চলে, বেশির ভাগই টিনের ছাদ। এই হল অধিকাংশ বাড়ীর নমুনা। কিন্তু ও ধরণের বাড়ী শহরে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সবই সেই সনাতন চালাঘর। জীর্ণ দারিদ্র্য-দশায় এরা ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে কম নয়, বরং বেশি, তেমনি তফাৎ পোষাকেও। অবশ্য শহুরে কাশ্মীরী বা একটু ভাল অবস্থার কাশ্মীরীদেরও পোষাকেরও তেমন খুব জলুস নেই, তবু তাদের পরনে কোট মাথায় সাদা পাগড়ি থাকে। চাষীদের পোষাক সে তুলনায় অত্যন্ত দীন—গরম কালে পরে হাঁটু অবধি পাজামা, কনুই অবধি কুর্তা, মাথায় একটা skull-cap, শীতকালে তার উপর একটা কম্বল জড়ানো, না হয় তো একটা আলখাল্লা। দারিদ্র্যের ছাপ খুব প্রকট। কাশ্মীরী খানার নাম তো জগৎজোড়া। কিন্তু ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না তেমনি সে খানাও ওরা নিজেরা খায় না প্রধানত ব্যয়সাধ্য বলে। সাধারণ লোকের খাবার হল দুবেলা ভাত, তার সঙ্গে শাকসব্জি কিছু, কখনও মাংস। অথচ কাশ্মীরীরা মাংস খেতে ভালবাসে--কিন্তু সাধ্যে কুলোয় না, রোজ মাংস খাওয়া তাদের কল্পনাতীত। গরীবদের অবস্থা সারা জগতেই এই। সুইট্‌-জরল্যাণ্ডেও দেখেছি ভদ্রসম্প্রদায় মাছ মাংস দুধ পনীর শাকসব্জি রুটি ইত্যাদি কতরকমের জিনিস খায় অথচ সেই মহাহিমের দেশে পর্বতচারী চাষীরা, বিশেষত গরীব চাষীরা,—দুবেলাই খায় ভুট্টা আর কফি; মাসে দু'চারদিন সামান্য মাংস।

এই দারিদ্র্যের কারণ অনেকগুলি। কাশ্মীরের হাতের কাজ—যেমন শালের কাজ, কাঠের কাজ, রূপোর কাজের—খ্যাতি জগৎজোড়া। বাইরে এসব জিনিসের দামও যথেষ্ট। আমরা দেখেছিলাম সাহ্‌ তুষের উপর আগাগোড়া কাজ করে একটি জামেয়ার তৈরী হচ্ছিল, ঐ একখানিরই দাম দুহাজার টাকা। কিন্তু তার মধ্যে জিনিসের দামটা খুব চড়া—তা বাদ দিয়ে কারিগরেরা যা মজুরী পায়

তা খুব বেশী নয়। সাধারণ কারিগরদের দৈনিক মজুরী এক টাকা দেড় টাকার বেশি নয়। কিন্তু এ কারিগরের সংখ্যাই বা কত—সমস্ত জনসংখ্যার কতটুকু অংশই বা এরা। এতে সারা দেশের অর্থ নৈতিক চেহারার খুব বেশি কিছু বদল হয় না। এই সব কুটীরশিল্প ছাড়া অন্য কোনও শিল্প কাশ্মীরে নেই, কাজেই সবটাই চাষের উপর বা ছোটখাট ব্যবসার উপব নির্ভর। দর্শকদেব সমাগম সেজন্য কাশ্মীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে-ও তো বছরে বড় জোর ছ' মাস। বাস্তবিক, কাশ্মীরের প্রায় সকল স্তরের লোককেই ছ'মাসের উপার্জনে সারা বছর কাটাতে হয়। শীতকালে চাষবাসও নেই, দর্শকসমাগমও নেই, জীবিকার কোনও উপায় নেই, সুতরাং গ্রীষ্মকালের উপার্জনের উপবই সারা বছব নির্ভর। এ অবস্থায় আরও নিদারুণ দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী, তাব উপর বর্তমানে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েছে। রাওয়ালপিণ্ডির পথ বন্ধ হওয়ায় এখন সব জিনিসই নিয়ে যেতে হয় পাঠানকোট-জম্মুব পথে, হয় মোটরে না হয় এরোপ্লেনে। দাম বেশি অনিবার্য। কেবল চালের দর সস্তা। শোনা গেল যে এক খারোয়ার অর্থাৎ ভ্রমণ ধানেব দাম নাকি পনের থেকে কুড়ি টাকাব কাছাকাছি। অবশ্য কালোবাজারও আছে। কাশ্মীরে প্রায় কুড়ি বছর থেকে ঢিলে ঢালা এক রকম প্রোকিওবমেণ্ট চলে আসছে। একবার ব্যবসাদারেরা দল পাকিয়ে দেশময় দাম বাড়াবার চেষ্টা করায় নাকি এই ব্যবস্থা চালু হয়। জাগীরদারদের কাছ থেকে বাড়তি ধান নিয়ে শহরে আনা হয়, মস্ত বড় বড় গোলা আছে শ্রীনগরে ঝিলমের ধারে -সেখান থেকে আবার শহর অঞ্চলে রেশন কার্ড মারফৎ বিলি করা হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থাটাই অত্যন্ত ঢিলে। কার কত জমি, কত উদ্বৃত্ত এ-সব সম্বন্ধে ঘরে ঘরে কোনই খোঁজ নেওয়া হয় না, ঐ যারা দিয়ে আসছে তারাই দিয়ে থাকে বরাবর। রেশন কার্ডও ঐ ধরণের। কোন মান্ধাতার আমলে যে পরিবারে লোকসংখ্যা ছিল তিনজন আজও তার রেশন কার্ডে তিনজনই রয়ে গেছে। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তা বাড়ে না। তবে

বাজারে এমন দোকানও আছে, সেগুলির দাম বাঁধবার একটা ক্ষীণ চেষ্টাও আছে—কিন্তু সে চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই কাজের হয় না। কাশ্মীরী ব্যবসাদারেরা তো এমনই তিরিশ টাকার জিনিসের দর হাঁকতে শুরু করে একশো টাকা থেকে, এ তো তাদের জন্মগত অভ্যাস। তার উপর শাসন ব্যবস্থা এখনও খুব কড়া হয়ে বসেনি, অনেকখানি ঢিলে ঢালা আছে, কাজেই এ ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আর কাশ্মীরকেই বা দোষ দিই কেন? ভারত-বর্ষের শাসন ব্যবস্থা তো ঢের কড়া, তবু সেখানেও তো এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও মনে আসে। এখানকার পরিস্থিতির কিছুটা ইতিহাস না জানলে এখনকার মানসিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যাবে না। প্রথমেই মহারাজদের কথা। মহারাজ প্রতাপ সিংহ বা গোলাপ সিংহের আমলে একালের গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না একথা সত্য। কিন্তু তখনও মহারাজার দরবার জনসাধারণের পক্ষে রুদ্ধ ছিল না। সাদিক চেলা গল্প বলে, জামার থানের দর চার আনা হতেই তারা দল বেঁধে মহারাজার দরবারে গিয়ে নালিশ জানিয়ে এসেছিল। মহারাজা ব্যবসাদারদের ধমকে দর কমিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় মোটর এরোপ্লেন ছিল না, মহারাজারা পথ চলতেন ঘোড়ায়, গ্রামে গ্রামে থামতেন, প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখাও হত, তাদের অভাব অভিযোগের কথা স্বকর্ণে শুনতেনও। অটোক্রেসি বটে, কিন্তু অনেক সময় benevolent autocracy. সে যুগে জনসাধারণ এতেই খুশী ছিল। ক্রমে হাওয়া বদল হল। মহারাজারা সাবেকি চাল ছাড়লেন, দরবারের পথ জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। মহারাজা প্লেনে মোটরে চলতে লাগলেন। জনতা থেকে তাঁর ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল, তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল য়ুরোপে ইংলণ্ডে। প্যারিস থেকে এলো এক লাখ টাকার আসবাব, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ আসবাব হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও।

জনচিত্ত আহত হতে শুরু করল। কিন্তু জনচিত্ত সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ হল কাশ্মীর গণ্ডগোলের সময়। মহারাজা সেই বিপদের মুখে দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কাশ্মীর ছেড়ে চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়ায়। এর পিছনে কি রহস্য ছিল, তা বলতে পারব না। কোন কোন উচ্চ রাজনৈতিক মহলে শুনেছি, শেখ আবদুল্লা নাকি মহারাজ হরিসিংহের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হননি, সেইজন্য করণ সিংহ যাতে রাজ-প্রমুখ হতে পারেন, সেই জন্যই নাকি হরি সিংহকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু একথা সত্যই হোক মিথ্যাই হোক, দেশের লোকের কাছে আজ বহুলপ্রচারিত যে হরি সিংহ বিপদের সময় পালিয়েছিলেন। পদস্থ কর্মচারী হতে শুরু করে ব্যবসাদার টাঙ্গাওয়ালা মোটর ড্রাইভার প্রভৃতি সকলেই মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করে। সেজন্য মহারাজা নামক প্রতিষ্ঠানটির উপর তারা আস্থা হারিয়েছে।

পাকিস্থানী হানাদারেরা এদের উপর অত্যাচার করেছে যথেষ্ট। লুঠতরাজ করেছে, বাড়ীঘর পুড়িয়েছে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে। মেয়েদেব শরীর থেকে গয়না ছিঁড়ে নিয়েছে, নারী অপহরণও করেছে। সেসব কথা এরা এখনও ভুলতে পারেনি। কিন্তু এ সবের জন্য যে পরিমাণে তীব্র বিরাগ থাকা স্বাভাবিক ছিল ততখানি তীব্র বিরাগ লক্ষ্য করিনি, অন্তত বিবাগ থাকলেও তার খুব জ্বালাময় প্রকাশ বেশি দেখিনি। (প্রসঙ্গত একথা কি সত্য যে, শেখ আবদুল্লা রাজত্বভার পেয়েই বলেছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষ বা পাকিস্থান কোনটির সঙ্গে যোগ দেবেন, তা ঠিক করেননি ?) কিন্তু একথাও সত্য যে, পাকিস্থানের প্রতি এদের অনুরাগও নেই। আসলে সকল লোকই খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, কাশ্মীর হল কেবলমাত্র কাশ্মীরীদেরই জন্য। রাজনৈতিক কর্মী ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের ছোট বড় কর্মকর্তা হতে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই কথা ভাবতে একেবারে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যে, কাশ্মীরের আকাশ বাতাস জলস্থলে কাশ্মীরীদেরই পরিপূর্ণ অধিকার। এর ফলে আমি

যে সময় গিয়েছিলাম সে সময় দেখেছি তারা যে ভারতবর্ষের অংশ একথা তাদের চিন্তায় আসে না। ভারতবর্ষ তাদের বন্ধুরাষ্ট্র, মিত্রশক্তি, সৈন্যবল ও অর্থবল দিয়ে তাদের বিপদে সাহায্য করেছে, তার জন্য তারা কিছুটা কৃতজ্ঞ, এইমাত্র। মহাত্মা গান্ধী একজন বড় নেতা, নেহরু তাদের বন্ধু। কিন্তু নেহরু যে তাদেরও প্রধানমন্ত্রী, কাশ্মীরের প্রতিনিধি যে ভারতবর্ষের আইনসভায় আসন গ্রহণ করে ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করছে, এসব চিন্তাভাবনার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না; যাঁরা রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচের কথা কইতে অভ্যস্ত নন, এমনই সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় অবিরতই দেখেছি, কাশ্মীর হল কাশ্মীরীদের জন্যই, ভারতবর্ষ তাদের সাহায্যকারী বন্ধুরাষ্ট্রমাত্র—এই ভাবটাই তাদের কথাবার্তায় খুব দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের পতাকা কাশ্মীরের কোথায়ও দেখা যায় নি। সযত্ন চেষ্টায় এখন এই চিন্তাধারা চারপাশে এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, সে বিশ্বাসের তীব্রতা দেখে মনে হয়, এরপর শেখ আবদুল্লাও আর এর মোড় ঘোরাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এ বিশ্বাসের তীব্রতা তার প্রতিক্রিয়া তুলেছে জম্মু আর লাদাখ অঞ্চলে। এদিকে যতই এই বিশ্বাস বাড়ছে, ওদিকে জম্মু এবং লাদাখ ততই ব্যাকুল হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য। কিন্তু জম্মু বা লাদাখে যাই হোক, কাশ্মীর উপত্যকার লোকের মনোভাব অন্য। আর কাশ্মীর উপত্যকাই ওখানে রাজনীতির পুরোভাগে।

* এই সব কথা কয়েকবছর আগের কথা। হয়তো এখন অবস্থার বদল ঘটেছে। আমি সেসময় যা দেখেছিলাম তাই লিখেছিলাম।

॥ আট ॥

অবশেষে স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আমাদের যাত্রা স্থির হয়ে গেল শ্রীনগর থেকে কলকাতা। প্রথম দর্শনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো দেখার মত জেগেছিল ক্ষোভ ; শেষের দিনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো বারবার দেখবার মতই বোধ হয় মিললো সান্ত্বনা। শুধু দার্শনিক সান্ত্বনা নয়, চোখেরও তৃপ্তি। শ্রীনগরের বাজার গলি দেখতে দেখতে মনে হয় কাশ্মীরেব সৌন্দর্য বুঝি কেবলই "দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।" কিন্তু কাশ্মীরশ্রীকে তার পরিপূর্ণতায় গ্রহণ কবতে পারলে তার বিচিত্র শোভায় মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিশেষত যারা আল্পসেব সৌন্দর্য দেখেননি, তাঁদের পক্ষে এ শোভা অনাস্বাদিতপূর্ব। ভারতবর্ষে এমন তুষার, পাহাড়, নদী, হ্রদ এবং শ্যামল উপত্যকার মিলন আর কোথায়ও ঘটেনি। এক হিসেবে আল্পসের শোভা হতেও এ অনন্য। আল্পসে উপত্যকাগুলির পরিধি ছোট, এমন দিগন্তবিস্তৃত নয়। সেইজন্য যেন আরও অনেকটা বুকচাপা, কিন্তু এখানকার সবুজ ধানে হিল্লোলিত দিগন্তব্যাপী মাঠ উদার মুক্তির নিঃশ্বাস আনে। মাঝে মাঝে চেনার পপলার উইলো সাইপ্রেসের সারি ; কোথায়ও কোথায়ও হ্রদ, বাঁকে বাঁকে চলেছে নদী, দূরে তুষারের ইঙ্গিত, আরও আরও দূরে বিশাল পাহাড়ের সারি, ঘনীভূত তুষার আর তুষার-নদী, আরও দূবে হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরি শ্রেণী, তার ফাঁকে ফাঁকে পথ চলেছে খোরাসান ইয়ারকন্দ সমরকন্দের দিকে। যাত্রার পূর্বদিন গৃহতরীর ছাদে বসে আছি স্তব্ধ যয়ে ; বিকেল হয়ে মাথায় ঢলে পড়েছে পড়ন্ত রোদ, শিকারা চলেছে মাঝে মাঝে জলতরঙ্গ তুলে,

চারদিকে প্রশান্ত স্তব্ধতা। দিনের আলো ক্রমশ মিলিয়ে গেল; নেমে এলো অন্ধকার, মাথার উপর তারাখচিত আকাশ, দুপাশে স্তব্ধ চেনারের সারি। প্রাণের স্পন্দন বাইরে দেখা যায় না, অথচ সমস্ত প্রাণশক্তি যেন স্তব্ধতার মধ্যে সংহত ও উদ্যত হয়ে আছে। অনুভব করতে পারি, এমনি সময় ঝিলমনদীবক্ষে বসেই তো কবি অনুভব করেছিলেন,--

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার :
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এলো তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে পারে না স্পষ্ট করি--
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥

সে সময় যদি হঠাৎ হু হু করে বাতাস বয়ে যেত, বলাকার তীব্রগতিছন্দে আকাশ চিরে জাগত স্পন্দন, তাহলে সত্যিই মনে হত সেই অব্যক্তের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে হঠাৎ প্রাণের লীলা দিগন্তসম ঢেউ তুলে গেল, তার আবেগে গাছের সারি পাহাড়ও চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন—

এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ কবিতার সাহিত্যিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা যাই থাক্, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কবিতার সেই দৃশ্য—সেই তারাফুলে খচিত স্তব্ধ আকাশ, মৌন পাহাড়ের সারি, কালি-ঢালা নদীর পাশে নিস্তব্ধ তরুশ্রেণী—এ সবের মধ্যেই অনুপরমাণুতে কি চঞ্চল প্রাণলীলা চলছে,—আজ যদি হঠাৎ চোখের আবরণ সরে যায় তখনই তো এই লীলা প্রত্যক্ষ হবে,—বাইরের স্তব্ধতার ঢাকা খুলে গিয়ে সর্বত্র জীবন স্পন্দন জেগে উঠবে।

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্য জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

———